উড়ো পাখী

আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

—আট টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শক্তি প্রেস, ১০ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেন লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীএককড়ি ভড় কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমান সরোজ গুপ্ত

স্নেহাস্পদেষু

উড়োপাখী

—এ বাড়ি আপনি কিনলেন ?

না ডাকতেই এই প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমার নতুন কেনা বাড়ির বারান্দায় উঠে এলেন।

কাঁচা পাকা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পেশী পেশী মুখ, আর তামাটে রঙে ভদ্রলোককে বলতে কি বেশ একটু অমার্জিতই দেখাচ্ছে।

তা ছাড়া সাজ। সেও হৃদয়-মনোহর নয়।

গলাবন্ধ কোট, কোটের নীচের দিকে খাটো ঝুল ধুতির কোঁচা এবং জীর্ণ বিবর্ণ বিদ্যাসাগরী চটি। বিচিত্র সমাবেশে ভদ্রলোক যেন বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠেছেন।

তবু সত্যি বলব, মুখের চেহারায় একেবারে নিম্নশ্রেণীও মনে হচ্ছে না। যেন একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত আভিজাত্যের শেষ ধূলিকণা।

ওইটুকুর জন্যেই 'ভদ্রলোক' বলতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে দেখে প্রীত হবার মত চেহারা যে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রীত হলামও না।

জানি এই ধরনের ভদ্রলোকেরাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসে প্রথম দিনেই মাইনে জিগ্যেস করে। নিরাবরণ ভাষায় বাজার দর আর আধুনিক ছেলেমেয়েদের সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে আড্ডা জমাতে চেষ্টা করে, আড্ডার সুযোগ নিয়ে নিজের বাড়ির চায়ের খরচ আর খবরের কাগজ কেনার খরচ বাঁচায়, অন্যের ট্রাম-বাসের মান্থলি টিকেট চেয়ে নিয়ে গিয়ে সাতদিনে ফেরৎ দেয় না, আর সামান্য আলাপেই ফস্ করে ধার চেয়ে বসে।

নতুন আসা পাড়ায় এ রকম একটি 'টাইপ' চরিত্রবানের উপস্থিতি মনকে অপ্রসন্ন করে তুলল।

তবু ভদ্রতা বলে কথা। যার দায়ে লোককে অভিনেতা হতে হয়, মিথ্যাবাদী হতে হয়, শঠ হতে হয়, কপট হতে হয়। আর শেষ

অবধি নিতান্ত ভালমানুষ ব্যক্তিকেও রূঢ় রুক্ষ হয়ে উঠতে হয়।

যাক্ যা যা হতে হয়, তা তো হতেই হবে।

ভদ্রসমাজ বলে জায়গাটায় যখন আছি।

সেই সমাজের দায়েই মুখের রেখায় যতটা সম্ভব সস্মিত ভাব ফুটিয়ে তুলে বলি—এই যে আসুন। এসে পড়লাম আপনাদের আশ্রয়ে।

ভদ্রলোক সবেগে মাথা নেড়ে বলেন—না না, ওসব কথা কেন? আশ্রয় কিসের! আমিই বলে 'বায়ু ভূতো নিরাশ্রয়ঃ'!

মনে মনে হাসলাম। ভদ্রলোক বোধকরি ভাবছেন 'নবাগতের' বিপন্নতা নিয়ে আমি এক্ষুনি ওঁকে 'ঝি যোগাড় করে দিতে পারেন কি না, ভাল দুধ কোথায় পাওয়া যায়, ধোবা কতদূরে থাকে', ইত্যাদি প্রশ্নে আক্রমণ করে বসব।

সহাস্যে তাঁর আশঙ্কায় শান্তিজল ছিটিয়ে বলি—তা আশ্রয় বৈকি। নতুন প্রতিবেশী হয়ে এলাম যখন।

ভদ্রলোক আর একবার মাথা নাড়লেন—না মশাই, আমার প্রতিবেশী হবার সৌভাগ্য আপনার হয় নি। হয়ে কাজও নেই অবশ্য। আমি উড়োপাখি উড়ে উড়ে বেড়াই, বাসা কোথাও বাঁধি না। আমাদেরই বোধ হয় ভবঘুরে বলে। বলে হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

আমার এই নতুন কেনা পুরনো বাড়িটা টালীগঞ্জের এ দিকে, একটু নির্জন নির্জন জায়গায়। কাছে এখনও গাছপালা আছে।

ভদ্রলোকের প্রবল হাসির শব্দে কাছের একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে কতকগুলো বসা পাখি উড়ে গেল। ভদ্রলোক এ পাড়ার বাসিন্দা নয় শুনে উৎসাহ বোধ করলাম। এবং একটু অবিমিশ্র ভদ্রতার আগ্রহ নিয়েই বললাম—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না।

—হ্যাঁ, এই যে বসছি।

ভদ্রলোক টেবিলের লাগোয়া পাতা বেতের চেয়ারটাকে হিড় হিড় করে টেনে হাত তিনেক দূরে স্থাপিত করে নিজে তার উপর স্থাপিত

হলেন। বললেন—বসব বলেই তো এলাম। অনেকদিন আসি নি এদিকে, আজ হঠাৎ এপথে আসতে আসতে নজর পড়ল পড়ো বাড়িটায় নতুন রং পড়েছে। দেখে হঠাৎ মনে কেমন রং ধরে গেল। উঠে এলাম না ডাকতেই। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সিলিঙের নীচের চওড়া কার্নিশগুলো উড়িয়ে দিয়েছেন। দেখে—

—আগে এ পাড়ায় থাকতেন বোধহয়? প্রায় নিশ্চিত হয়েই প্রশ্ন করি।

ভদ্রলোক কিন্তু আমার এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেন না। কথা ঘুরিয়ে পুরনো বক্তব্যের জের টানেন—দেখে তাই মনে হল, 'পুরনো মলিন মুখে ছেড়ে দেবে পথ, সেথা যাবে সগৌরবে নতুনের রথ।'

মৃদু হেসে প্রশ্ন করি—কবিতা বানানোর অভ্যাস আছে বুঝি?

ভদ্রলোক সহসা সেই খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখে নববধূ সুলভ একটু লাজুক ভাবের আমদানী করে বলেন—ছিল। এখন আর নেই। ওসব বদভ্যাস অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

এই 'ছেড়ে দিয়েছি' কথাটা সর্বনেশে। ঠিক জানি, ওই ছেড়ে দেওয়া বস্তুরই দু-চারটি নমুনা দৈবাৎ ওঁর পকেটের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়বে, আর আমাকে শেষ পর্যন্ত কবিতার শ্রোতা হতে হবে। হৃৎকম্প হল। ওর চাইতে ভয়াবহ আর কি আছে? কথার মোড় ফেরাতে বললাম—একটু চায়ের কথা বলি?

বলা বাহুল্য প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। যেখানে বলামাত্রই পাবার আশা রাখি।

ভদ্রলোক কিন্তু আমার লোকচরিত্র জ্ঞানের অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠেন—না, না। আমার সঙ্গে ওসব ফর্ম্যালিটির দরকার নেই মশাই। বললাম তো আমি হচ্ছি উড়োপাখি, সামাজিক, লৌকিক, এসব বন্ধনের মধ্যে আমি নেই।

—আহা-হা একটু চায়ে আর—

ভদ্রলোক বাধা দিলেন—তা আপনারই বা একটু চায়ে কি

ইষ্টলাভ হবে? ছিল, এক সময় নেশা ছিল। সকালবেলা কাকেরা যেমন কা কা করে আমিও তেমনি চা চা করতাম। এখন আর সে সব নেই।

ভদ্রলোক একটি নিশ্বাস ফেললেন।

ক্রমশ যেন একটু আকৃষ্ট হতে থাকি। যে লোকের এক সময় কবিতা লেখার শখ ছিল এখন আর নেই, একদা চা খাওয়ার নেশা ছিল এখন আর নেই, নিশ্চয় তার কোন অতীত ইতিহাস আছে। কিন্তু অতঃপর কি প্রশ্ন করব ভেবে পাই না, তাই এদিক ওদিক ইতস্তত চাইতে থাকি।

ভদ্রলোক নিবিষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ বলে ওঠেন—দোতলার উত্তুর বারান্দা-মুখো ঘরটার পুব দেয়ালের সেই কুলুঙ্গীটা রেখেছেন? না বুজিয়ে দিয়েছেন? আজকালকার বাড়িতে তো আবার ওই সব কুলুঙ্গী-টুলুঙ্গী অসভ্যতা কিনা।

চমৎকৃত হই। সন্দেহ থাকে না বাড়িটি ভদ্রলোকের বিশেষ পরিচিত। কোন সময়কার ভাড়াটে হয়তো। সকৌতুকে বলি—কেন, ওই কুলুঙ্গীটা সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রেজুডিস ছিল নাকি আপনার?

—আমার! ভদ্রলোক সহসা ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলেন—আমার প্রেজুডিস কিসের? এ বাড়ির ঘরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

রাগ দেখে আরও কৌতুক অনুভব করে বলি—মনে তো হচ্ছে ইতিপূর্বে এ বাড়িতে বাস করে গেছেন।

—কক্ষনো না! ভদ্রলোক উত্তেজনার বশে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান, তামাটে মুখ লালচে করে বলেন—আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক। আপনার এ কথার মানে?

আমি তো অপ্রতিভের একশেষ। ব্যস্ত হয়ে বলি—কী আশ্চর্য! এতে আপনি এত—মানে এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম বই তো না। মানে হল, বাড়িটা সম্পর্কে যখন এত জানেন, হয়তো কোন সময় বাস করে গেছেন। যাক কিছু মনে করবেন না। বসুন, বসুন।

ভদ্রলোক আমার বিনয়ে অথবা নিজের আকস্মিক বিরক্তির

লজ্জায় একটু ধাতস্থ হলেন। চেয়ারটা ফের টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন—মনে করবেন না কিছু। টেম্পারটা সব সময় ঠিক রাখতে পারি না, বুঝলেন। অথচ এই আমিই—

আর একবার অবহিত হলাম। অর্থাৎ বুঝলাম ভদ্রলোক এখন এই রকম কিন্তু একদা নিতান্ত শীতল মস্তিষ্ক ছিলেন।

আরও একটা বিষয় অবহিত হচ্ছি। অনুভব করছি ইচ্ছে হলে ইনি নিজে হাজার কথা বকবকিয়ে যাবেন, কিন্তু প্রশ্ন করে কোন কথা আদায় করা যাবে না। অথচ কুলুঙ্গী সম্পর্কে আমার কৌতূহলটি বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। তাই অন্য পথ অবলম্বন করি। প্রশ্ন না করে বলি—আমার স্ত্রী গোড়ায় আপত্তি করেছিলেন কুলুঙ্গীটা বোজানো সম্পর্কে, বলেছিলেন—থাক। কিন্তু ঐ যা বলেছেন—সেকেলে। যে কন্‌ট্রাক্টরকে লাগিয়ে ছিলাম বাড়ি মেরামত করতে—সে বলল, এ যুগে শোবার ঘরে ওটা অচল।

ভদ্রলোক কিন্তু এবার আর ওদিকে গেলেন না। মিনিটখানেক নির্নিমেষ নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার স্ত্রী আছেন?

মৃদু হেসে বলি—তা যতক্ষণ না ভাগ্যবান হচ্ছি আছেন বৈকি!

—জীবন-মরণ নিয়ে পরিহাস করবেন না মশাই—ভদ্রলোক বিচলিত স্বরে বলেন—ভারি বদ অভ্যেস! কত বয়েস আপনার স্ত্রীর?

অন্য কেউ, মানে এরকম সন্থ পরিচিত কেউ এ হেন অভব্য প্রশ্ন করলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম তাকে। কিন্তু সত্যি বলতে, লোকটাকে ঠিক সাধারণ ভদ্ররীতির আওতায় ফেলছি না আর। সন্দেহ নেই কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব আছে ওঁর মধ্যে। চেহারা আর পোশাকের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ওর ওই অতলস্পর্শী চোখের বদ্ধ গভীর দৃষ্টি এই ধারণাটা বদ্ধমূল করে তুলছে।

কাজেই রাগ না করে হেসে উঠে বললাম—মেয়েদের বয়েস? ওকথা স্বয়ং বিধাতা পুরুষ, যিনি তাদের গড়েছেন তিনিও বলতে পারেন না।

—তবু একটা আন্দাজ তো আছে? ভদ্রলোক প্রায় ধমকে ওঠেন।

হেসে ফেলে বলি—সে আন্দাজটা আমাকে দেখেই ঠিক করুন।

—ঠিক আমি করেছি—ভদ্রলোক একবার আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন—আর নিয়েছি বলেই তো ভাবনা। দেখতে কেমন?

এবারে বিরক্তি প্রকাশ না করে পারি না। বেশ একটু তপ্তস্বরেই বলে ফেলি—আপনার প্রশ্নগুলো কি সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করছে না?

—করছে। ভদ্রলোক কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলেন—করছে তা জানি। কিন্তু আমি আপনাদের সভ্য সমাজের কে?

—আপনি কে, তা জানি না। তবে আমি সভ্য সমাজের মধ্যেই বাস করি।

—ভারী মহিমা করেন। ভদ্রলোক উল্টে চটে উঠে আমাকেই ধরাশায়ী করেন—সভ্য সমাজের মহিমা আর দেখাবেন না আমার কাছে। যত অসভ্যতা, যত নীচতা, যত পচা গন্ধ বেরোনো কদর্যতা আপনাদের ওই সভ্য সমাজের মধ্যেই বাস করছে, বুঝলেন? কত বয়েস আপনার? বড় জোর চল্লিশ। কম তো বেশী না। কাজেই মা লক্ষ্মী খুব বেশি হলেন তো ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। নয় কি না? আমার মতন একটা বুড়ো যদি জিজ্ঞেসই করে তিনি দেখতে কেমন, তাতে হলোটা কি? বলুন, কোন্ রাজ্য রসাতলে গেল তাতে?

হেসে ফেলি। বলি—নাঃ, রাজ্য রসাতলে যাবার কথা হচ্ছে না। আমাদের সংসারী লোকদের কথাবার্তায় কতকগুলো এটিকেট মেনে চলতে হয়।

মনে ভাবলাম, ভালরে ভাল। এ তো দেখছি চমৎকার—খুব বেশি হলো তো লোকে মাইনে জিজ্ঞেস করে, নয় তো সংসারের মাসিক ব্যয় কত জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এ কী! এ যে একেবারে কিম্ভুত প্রশ্ন! আর আশ্চর্য, আমার ধিক্কারে লজ্জার লেশমাত্র নেই। আমার কথায় উদাত্ত স্বরে বলেন—এটিকেট মানতে হয় মানুনগে আপনারা। আমার ওসব

পাট চুকে গেছে। এই যে আপনার এই বাড়ির পুরনো মালিকরা, তারাও খুব সভ্য ছিল, খুব এটিকেট দুরস্ত ছিল। রাজা নয়, রাজবংশও নয়, রাজাদের ভাগ্নে বংশ, তবু রাজকায়দায় চলতো। প্রত্যহ সকালে কনিষ্ঠরা এসে গুরুজনদের চরণ বন্দনা করে তবে দিনের কাজ আরম্ভ করতো। বয়স্ক ছেলেরা মায়ের ঘরে ঢুকতো এত্তালা দিয়ে, বড় ছেলের বারো বছর বয়েস হলে স্বামী স্ত্রী একঘরে শুতো না। কিন্তু তারপর শেষ অবধি হলোটা কি? এটিকেটের কথা আর আমায় শোনাতে আসবেন না।

আমি বাড়িটা কেনবার সময় আশপাশের কুলি-মজুরদের মুখে শুনেছি বটে 'রাজবাড়ি'। কিন্তু সেই ভগ্নদশা-গ্রস্ত রাজবাড়ির ইতিবৃত্ত কারো মুখে শুনি নি। কারা জানে, তা জানি না। পাড়ায় যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তারা কেউ কিছুই জানে না। তারা প্রায় সকলেই আমারই মত বহিরাগত। অনেকগুলো পুরনো পুরনো বাড়ি আর শ্রীহীন বাগান নিয়ে অনেকখানি অঞ্চল পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে ছিল। কোন বাড়িতে বংশের ভগ্নাবশেষ এক আধটা লোক বাস করতো, আর বাকী অংশ ভাড়া দিত, কোন বাড়িতে তাও না। তালা ঝোলানো দরজার পাশের ভাঙা খিলেনের হাঁ করা ফোকর দিয়ে গরু ছাগল ঢুকতো, আর ভিতরে গাছপালা গজিয়ে গেছে চোখে পড়তো। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই বন কেটে নগর বসায়, ভাঙা বাড়ি কিনে নূতন করে।

আমার এই বাড়িটা অত দুর্দশাগ্রস্ত না হলেও সারাতে মোটা খরচা হয়েছে বৈকি। সস্তায় পাওয়া সম্পত্তির লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়েছে। আর কেনবার সময় মূল মালিককে খুঁজে বার করতে যা বেগ পেতে হয়েছে, সে আর বলে কাজ নেই। স্ত্রী তো রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। আমার এই সস্তায় ভাঙা বাড়ি কেনার মনোভাব নিয়ে সমালোচনার বন্যা বহিয়েছিলেন। এর থেকে—অর্থাৎ শহরের উপকণ্ঠে এই প্রকাণ্ড ভূতুড়ে বাড়িটা কেনার থেকে মাঝ কলকাতায় একটি দুখানি ঘরওয়ালা বাড়ি তৈরি করালেও

যে অনেক শাস্তি ছিল, তা নিয়ে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়েছেন, কিন্তু আমি তখন ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় মশগুল। বেশ অনুমান করছি শহরের বাহু প্রসারণের চাহিদায় এ সব অঞ্চল শীগ্ গিরই দামী হয়ে উঠবে, পিছনের ঐ পোড়ো বাগানটার জমিই দশ বারো হাজার টাকা কাঠা দরে বেচতে পারব, সারা নীচতলাটা ভাড়া দিয়ে আর দোতলায় বাস করে বাকী জীবনটা বিনা খাটুনিতে চালিয়ে দেব।

তবু বলব, শুধুই ঝুনো বুদ্ধির চিন্তা নয়, বাড়িটা তার ভগ্নসৌন্দর্য নিয়েই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এমন বড় বড় উঁচু উঁচু ঘর, এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানলা দরজা, এমন চারিদিক ঘেরা জাফরি কাটা বারান্দা, আর এমন মার্বেল পাথরের ধারি দেওয়া চার-হাত চওড়া সিঁড়ি গেরস্থ বাড়িতে পাব কোথায়? আর নিজে তৈরি করার আশা? সে তো দুরাশা মাত্র।

বাড়ি সারিয়ে নিয়ে বসার পর অবশ্য স্ত্রী আর বিমুখ নেই। বরং বেশ উৎফুল্লই হয়ে উঠেছেন, যখন আশা পেয়েছেন দোতলার একাংশও আমি বিলি করব মনস্থ করেছি, আর ব্যবস্থা করছি সেখানে তাঁরই পিত্রালয়ের পরমাত্মীয়কে প্রতিষ্ঠিত করবার।

সত্যি ভেবে দেখছি শুধু এত বড় দোতলাটাও সন্তানহীনা একা মহিলার পক্ষে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠবে। আর আমারই বা প্রয়োজন কতটুকু? গৃহিণীর জন্যেই গৃহ। তাঁর মা ভাই এসে বাস করতে থাকলে, তাঁর নিঃসঙ্গতার দুঃখ ঘুচবে, কাজেই সর্বদার জন্যে অভিযোগও ঘুচবে।

এটিকেটের কথায় যবনিকাপাত করে বললাম—কুলুঙ্গী-রহস্যটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে বেশ খোঁচা হয়ে রইল। আপনি যে বিশেষ করে কেন ওইটার সম্বন্ধেই—

ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা আর একদিন সব বলব। এ বাড়ির সমস্ত ইতিহাস।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, বাইরের এই বারান্দাটায় এখনও আলোর ব্যবস্থা করা হয় নি, তবু ঈষৎ ব্যগ্র হয়ে বললাম—বিশেষ কাজ আছে নাকি এখন ?

—কাজ ? আমার কথা বলছেন ? ভদ্রলোক কেমন এক উদাস হাসি হেসে বললেন—নাঃ কাজ আর নেই। সে সব অনেক দিন ফুরিয়ে গেছে।

—তবে বসুন না একটু। অবিশ্যি এখানে আলো নেই, অনুগ্রহ করে যদি ঘরে ঢুকে—

—ফর্ম্যালিটি করবেন না মশাই, ফর্ম্যালিটি দেখালে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অনুগ্রহ টনুগ্রহ ওসব কি! আমি আপনাকে বুঝলাম, আপনি আমাকে বুঝলেন, ব্যস চুকে গেল। আর অন্ধকারের কথা বলছেন ?

হঠাৎ ভদ্রলোক হা-হাঃ হা-হাঃ রবে কেমন একটা ভুতুড়ে হাসি হেসে উঠলেন—আমার তো মশাই অন্ধকারেই জমে ভাল।

এই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় আর চারিদিকের গা-ছমছমে নির্জন পরিবেশের মাঝখানে ওই হাসির শব্দে সমস্ত লোমকূপ যেন সিরসির করে উঠল। ভাবলাম থাক, আমার আর পুরনো বাড়ির ইতিহাস শুনে কাজ নেই। ভদ্রলোক বিদায় হচ্ছেন হোন। কিন্তু পৃথিবীর মজাটি এই যে মুহূর্তে আপনি কোন বস্তুতে আকর্ষণ হারাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সে বস্তুটি আপনার ঘাড়ে এসে চাপবে।

আমি যখন ওঁর বিদায় গ্রহণটাই কাম্য মনে করছি, উনি তখন ফের চেয়ারটা টেনে বসে পড়েছেন। ওঁর মুখের সেই তামাটে রংটা এখন প্রায় কালো দেখাচ্ছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো দৃষ্টির বাইরে পড়ে গেছে, মাথার চুলের দু-রঙা রূপ একরঙা হয়ে উঠেছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে উনি বললেন—আচ্ছা শুনুন তবে। বলেই যাই আপনাকে। আপনার মত এমন আগ্রহী শ্রোতা আবার কবে পাই না পাই! তবে একটি অনুরোধ—বারে বারে প্রশ্ন করে আমার মুড নষ্ট করে দেবেন না। ওই বদ অভ্যাসের দোষেই এ

বাড়ির সেই ভাড়াটেটাকে—

ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

আর বলব কি, ওই হঠাৎ চুপ করে যাওয়া অসমাপ্ত সামান্য কথাটুকুতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মনে হল আমার আগের কোন ভাড়াটে ভদ্রলোককে ইনি ভয়ানক একটা কিছু করে বসেছিলেন। গলা টিপে ধরেন নি তো? দিনের আলোয় যাকে একটি অমার্জিত ধরনের বাজে বুড়ো বলে অগ্রাহ্য আসছিল, তাকে এই অন্ধকারের পটভূমিকায় হঠাৎ কেমন ভীতিকর মনে হল। বুকটা আর একবার কেঁপে উঠল। লোকটা মানুষ তো?

চট করে ওর মুখোমুখি স্থির হয়ে প্রশ্নহীন নীরব শ্রোতা রূপে বসে থাকবার সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করতে পারলাম না। চঞ্চল হয়ে বললাম—কিন্তু তার আগে একটু চা কি মিষ্টি না খাইয়ে···এক মিনিট বসুন, আমি বাড়িতে বলে আসছি।

বলে আসবার জন্যে আমার নিজের না উঠলেও চলতো, এখান থেকে হাঁক পেড়ে আমার বালক ভৃত্য দুলালকে ডেকে ভিতরে খবর দেওয়াতে পারতাম, কিন্তু ওই যা বললাম, বসে থাকতে পারলাম না। ভিতরে চলে এসে অনাবশ্যক চিৎকারে ডাক দিলাম—দুলাল! দুলাল!

বলা বাহুল্য দুলালের সাড়া পাওয়া গেল না। এ বিষয়ে এমনিতেই সে বরাবরই আদর্শ ভৃত্য 'কেষ্টার' সমগোত্র। যখনই তাকে ডাকা যায়, তখনই—'নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা'র পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ বাড়িতে এসে তো আরও। নীচের তলায় এখনও ভাড়াটে সমাগম হয় নি, অতগুলো ঘর দালান বারান্দা জাফরি রান্নাবাড়ি ইত্যাদি করে সমস্ত খালি খাঁ খাঁ করছে, কাজেই বাড়ির দ্বারপালের ডিউটি অনায়াসে পরিত্যাগ করে সে দোতলায় তার 'মা'র চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেয়। অতএব নীচতলার দালান থেকে আমার ডাকটা শুধু প্রতিধ্বনিত হয়ে আমারই কাছে ফিরে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পিছনে একটি ব্যঙ্গোক্তি ধ্বনিত হল—কী মশায়, ভয় পেলেন না কি? হাঃ হাঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ।

মুহূর্তের জন্য শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার ক্ষমতা রইল না। বুঝতে পারলাম না লোকটা বাইরে থেকেই হেসে উঠেছে, না আমার পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসেছে।···অনেকটা পরে যখন হাসির রেশ মিলিয়ে গেল, চৈতন্যের সঞ্চার হল, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। আর দেখলাম বাইরের ওই পাথরের নক্সাকাটা গোল বারান্দাটা শূন্য। অন্ধকারে সমস্ত নক্সাটা লেপে পুঁছে শুধু কালো দেখাচ্ছে। একেবারে সদরটায় আলোর ব্যবস্থা করতে দেরী করাটা অমার্জনীয় ত্রুটি হয়েছে তা অনুধাবন করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কালই এর একটা বিহিত করা দরকার। আসল কথা, এখানের জন্যে একটি বিশেষ ধরনের বড় আলোর সন্ধানে রয়েছি বলেই এই বিলম্ব। লোকটা চলে গেছে। তার মানে আমার ভয়ের চাঞ্চল্যটা ধরে ফেলেছে। মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হলাম। হাঃ হাঃ হাসি কি ইতিপূর্বে আর কখনও কারও শুনি নি! এ রকম নির্জন পরিবেশে ওর ওই হাসিটা বিদঘুটে অশোভন মনে হতে পারে ঠিকই, কিন্তু অলৌকিক মনে করবার হেতু কি ছিল? ভয়ই বা পেতে গেলাম কেন? কেন গেলাম, তার অবশ্য হিসেব হল না। রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে দুদিকে তাকালাম, কোন দিকে দেখতে পেলাম না। বুড়ো লোক, তবু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটে বুঝলাম। নইলে এত শীগ্‌গির মিলিয়ে গেল কি করে?

॥ দুই ॥

উপরে উঠে আসতেই বর্ষা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—বেশ লোক যা হোক! সেই যে নেমে গেল আর আসার নাম নেই। দুলাল বলল, একটা বিচ্ছিরি বুড়ো বাবুর সঙ্গে গল্প জমিয়েছ,—লোকটা কে? কোথা থেকে জুটল?

আমি গম্ভীরভাবে বলি—লোকটা কে এবং কোথা থেকে জুটল,

এ প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি।

—তার মানে ?

—মানে জানি না। তবে লোকটা এ পাড়ার নয়। হয়তো—

মুখে আসছিল হয়তো এ জগতেরই নয়। কিন্তু মুখকে সামলে নিলাম। ভীতু মানুষটাকে ভয় ধরিয়ে দেবার দরকার কি ? ভয় জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে, সে ভয় বর্ষার মন থেকে তার স্নেহাস্পদ ভৃত্য দুলাল এবং শ্রদ্ধেয়া রাঁধুনী 'বামুনদি'র মনের মধ্যেও যে ছোঁয়াচ লাগাবে না কে বলতে পারে। তাই 'হয়তো' বলে চুপ করলাম। কিন্তু অসমাপ্ত কথায় দাঁড়ি টেনে কোন বিবাহিত ব্যক্তি কবে ছাড়ান পেয়েছে ? পায় নি। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষা বলে উঠল—হয়তো কী ? বলো শীগ্‌গির।

অগত্যাই বলতে হল—হয়তো—মানে আর কি, ঠিক ভদ্রলোক বলতে আমরা যা বুঝি বোধ হয় তা নয়।

—চমৎকার! অথচ তার সঙ্গে গল্প করে এতক্ষণ সময় খরচা করলে ? কি এত গল্প হল ?

—এমন কিছু না।

—মনে হচ্ছে তুমি যেন কিছু চাপছ।

—চাপাচাপির কি আছে ?

—বারে বারে ঐ দেওয়ালটার দিকে তাকাচ্ছ কেন ? বর্ষা ভুরু কোঁচকায়।

—বারে বারে আবার কি! এমনি।

—তোমার ভাবটা আজ আমার ভাল লাগছে না।

বলা বাহুল্য আর যার কাছে যাই হোক, স্ত্রীর কাছে কখনও ভাব গোপন করা যায় না, বললাম—যে ভদ্রলোক এসেছিল—

—এই যে বললে ভদ্রলোক নয় ?

—আহা একেবারে 'নয়' তাও বলি নি। তাছাড়া একটা কিছু তো বলতে হবে। লোকটা কেমন যেন একটু রহস্যময়। মনে হল এই বাড়িটার পুরনো ইতিহাস জানে, আর সে ইতিহাস বোধ হয় বেশ

ঘোরালো।

—ওমা তাই নাকি? বর্ষা হৈ হৈ করে ওঠে—তা শুনে নিলে না?

—শুনব বলেই তো বসছিলাম—

এইখানে একটি মধুর মিথ্যা বলে নিই। বলি—ভাবলাম তোমায় একটু খবর দিই, তুমিও শুনবে। তা লোকটা হঠাৎ ঝপ করে উঠে চলে গেল।

বর্ষা আপসোসের ভঙ্গিতে বলে—ইস! শুনলে বেশ হত। কাল একটা বুড়ি ঘুঁটেউলি এসেছিল, বলছিল এটা নাকি আগে রাজবাড়ি ছিল। সে খুব ছোটবেলায় তার নানির সঙ্গে আসত এখানে। মাঝে বিয়ে-টিয়ে হয়ে চলে গিয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে এখন বাপের বাড়ির একটু জমি পেয়ে এখানে ঘর তুলে থাকতে এসেছে।

—তাই নাকি? নাম কি বুড়ির?

—নাম খুব উচ্চাঙ্গের। হেসে ওঠে বর্ষা—নাজমা বেগম।

—ওঃ। থাকে কোথায়?

—ওই মসজিদটার ওদিকে। এ অঞ্চলে বেশির ভাগই তো মুসলমান বস্তি।

—হ্যাঁ, আর শিকড় ধরে টানলে হয়তো দেখবে সকলেই কোন না কোন নবাবের লতাপাতা।

হেসে উঠি আমরা দুজনেই। আর হাসি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে কাঠ হয়ে যাই একটি সম্ভ-পরিচিত কণ্ঠস্বরে। সে কণ্ঠ এই বাণীটি বিতরণ করে—হাসির কিছু নেই। আজ যে রাজতক্তে, কাল সে মাটির নিচে। এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

তাকিয়ে দেখলাম ঘরের দরজার সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক। এ হেন দার্শনিক উক্তিটি তাঁরই। হঠাৎ মনে হল আমি যেন কোন পিশাচের কবলে পড়ে যাচ্ছি। বিচলিত স্বরে বললাম—এ কী! আপনি এখানে!

—চলে এলাম।

—চলে এলেন! কষ্টে এইটুকু উচ্চারণ করতে পারি।

আর ততক্ষণে বর্ষা অকুতোভয়ে এগিয়ে গেছে। বেশ জোর গলায় বলে ওঠে সে—কে আপনি? এমন বলা কওয়া নেই হঠাৎ দোতলায় উঠে এলেন যে। দরজা খুলে দিল কে আপনাকে?

—দরজা? ভদ্রলোক একটি দার্শনিক হাসি হেসে বলেন—আমাকে দরজা? ও না খুলে দিলেও চলে।

—মানে? কী বলতে চান আপনি? বর্ষা চেঁচিয়ে ওঠে—দুলাল! দুলাল!

—আপনার দুলাল দিব্যি হাওয়ায় পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে। কিন্তু মা লক্ষ্মী, আপনাদের যখন এত ভয়, তখন এই হানাবাড়িটা কিনলেন কেন?

—হানাবাড়ি! অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল বি. এ. পাস বর্ষা। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলাম এম. এ. পাস আমি।

—তা এক রকম হানাবাড়ি বৈকি। ভদ্রলোক হঠাৎ স্বরটা পালটে কেমন বিষণ্ণ হয়ে বললেন—এর ইতিহাসটা বলতে ইচ্ছে হয়েও তখন চলে গিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম ইনি ভয় পেয়েছেন। কিন্তু আবার হঠাৎ লোভ হল। ভাবলাম, এই জমাট হয়ে থাকা কথার ভার তো নামাতে পাই না। যদি একবারও—

লোকটার চেহারা আর সাজসজ্জার সঙ্গে বেদনাভারাক্রান্ত সুরটা বেমানান। একটু অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকি। বর্ষা আস্তে বলে—কিন্তু আপনি এলেন কি ভাবে? সিঁড়ির দরজা তো আমি নিজে হাতে—

—দরজা? হঠাৎ ভদ্রলোক আবার সেই ভুতুড়ে হাসি হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ শব্দে। সে শব্দ কড়িকাঠে উঠে ধাক্কা খেল। সে শব্দে বর্ষা লোকলজ্জা ভুলে আমার কাছে সরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

ভদ্রলোক কথা শেষ করলেন—এ বাড়িতে কত চোরা দরজা আছে তার খবর রাখেন? ওই কুলুঙ্গীর পিছনেই তো—ওটা দেখছি বুজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চোরকুঠুরি থেকে যে সিঁড়িটা—

—চোরকুঠুরি থেকে সিঁড়ি! আমরা দুজনে যুগপৎ প্রায় আর্তনাদ

করে উঠি—আরও সিঁড়ি আছে এ বাড়িতে ?

—আছে বৈকি। ভদ্রলোক সস্মিতবদনে বলেন—বাড়ির ভিতের দেয়াল দেখেছেন এক একখানা ? আড়াই হাত তিন হাত চওড়া। বিশেষ একটি দেয়ালের ফাঁপা গর্তে—আচ্ছা বসুন, গোড়া থেকেই বলি—

ভদ্রলোক গলা ঝেড়ে শুরু করলেন—অদ্ভুত কৌশলে তৈরি এই বাড়ি। বিশেষ এক একটি দেয়ালের ফাঁপা গর্তয় আছে চোরা দরজা, চোরা ঘর। তার ভিতরে ঘটে গেছে কত রহস্যলীলা, কত ভয়াবহ কাণ্ড! যে সব মিস্ত্রীরা ওই সব চোরা ঘর করে ছিল, তাদের সকলকে কোনও এক চোরা পথ দিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে এই দুনিয়া থেকে।

—তার মানে ? শিউরে উঠি। বর্ষা আমার আরও কাছে সরে আসে।

ভদ্রলোক বলেন—মানে অতি প্রাঞ্জল। গুপ্ত কথা যাতে চিরদিনই গুপ্ত থাকে তার ব্যবস্থা।

—উঃ! কী নৃশংসতা! সেকালে লোকে—

আমার কথায় বাধা পড়ে। ভদ্রলোক সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন —শুধু এইটুকু নৃশংসতা দেখে অবাক হচ্ছেন ? শুধু সেকালেই নৃশংসতা ছিল ? আজকের এই সভ্য দুনিয়ায় নেই এরকম নৃশংসতা ? আরও লক্ষগুণ নেই ? আদিঅন্তকাল ধরে পৃথিবীতে এই চলে এসেছে, চলছে, চলবে। বুঝলেন ? মানুষ যতই সভ্যতার বড়াই করুক আর যতই সাম্যবাদের বড় বড় বুলি আওড়াক, বড়লোকের লোভের আগুনে গরীবের জীবন ধ্বংস হবেই, নির্বোধ আর গরীবদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবেই। প্রায় নব্বই বছর আগে যখন এই প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল—

বর্ষা অস্ফুটে বলে—কে তৈরী করিয়েছিল ?

—কে ? কে করিয়েছিল তার সত্যি নাম আমি বলব না। তবে তার আগে যোগেশ্বরের ইতিহাস বলতে হয়। সেটা আরও আগে। যোগেশ্বর। যোগেশ্বর সামন্ত। সামন্ত যে কোন্ অঞ্চলের লোক তা

কেউ জানত না। জানত না কী তার বংশপরিচয়। যেন বানের জলে ভাসতে ভাসতে এখানে হঠাৎ কূল পেয়ে শেকড় গাড়ল।

অবিশ্যি কূল কি করে পেল সেও এক রহস্য। সতেরো আঠারো বছরের একটা ছেলে, একেবারে নিঃসম্বল, আজ কারো বাড়ি একটু আশ্রয় চায়, কাল কোন মুদির দোকানের চালার নীচে শুয়ে থাকে, এই তো শুরু। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ছেলেটা যেন আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ পেয়েছে। কেউ বলল, মাটিতে পোঁতা টাকার ঘড়া পেয়ে গেছে, কেউ বলল, ওই যে একটা ছাতা-সারানো বুড়ো মুসলমানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল যোগেশ্বর, সে নাকি মরণকালে তার লুকোনো টাকার আণ্ডিল যোগেশ্বরকে দিয়ে গেছে। যোগেশ্বর কাউকে কিছুই বলল না। জিজ্ঞেস করলে হেসে উঠত। তবে দেখা গেল যোগেশ্বর বিলিতি জাহাজে মাল চালানের ব্যবসা ফেঁদেছে। মালের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, যে কোনও রকম মালই তার হাত হয়ে জাহাজে উঠছে। সেই জাহাজই যোগেশ্বরের লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মীর ঘট মাথায় করে এগোতে এগোতে যোগেশ্বর কোন্ ফাঁকে এই অঞ্চলে একটি ছোটখাটো জমিদার হয়ে বসল। ওই যে ওধারে সব বস্তি দেখেছেন, ওই যে বড় বড় বাগানওয়ালা ভাঙা বাড়িগুলো, সমস্তই যোগেশ্বরের জমি।

কিন্তু অত জমির মালিক হয়েও যোগেশ্বর নিজে তখনও একখানা ছোট্ট বাড়িতে বাস করে। বছর বত্রিশ বয়েস হয়ে গেছে, বিয়ে-থা হয় নি, যেন একটা অর্থহীন জীবন। মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠে, মাঠে বাগানে পুকুরে জ্যোৎস্না ছড়ায়, যোগেশ্বর ভাবে কিসের জন্যে এমন ভূতের খাটুনি খেটে চলেছি। জীবনের লক্ষ্য কি? বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি?

এমনি এক চঞ্চল ক্ষণে যোগেশ্বরের জীবনে এক নারীর আবির্ভাব ঘটল। সে নারী যোগেশ্বরের কর্মজীবনের বন্ধু রাম মুখুজ্যের ছোট বোন পূর্ণলক্ষ্মী। কিন্তু যোগেশ্বর বন্ধুর বোনকে দেখে বিভোর হল বলে রাম মুখুজ্যে যে তার বাউণ্ডুলে বন্ধুটার সঙ্গে নিজের ছোট বোনের

বিয়ে দিয়ে তুজনেরই হিল্লে করে ফেলল, তা মনে করবেন না। বিয়ের প্রশ্নই নেই। প্রথম তো যোগেশ্বর হচ্ছে সামন্ত, তার মানে জল-অচল জাত, তা ছাড়া তার না আছে মা বাপ ভাই বোন, না আছে বংশপরিচয়, না আছে কুল শীল গোত্র। নিজের পদবী ছাড়া আর কিছুই জানত না সামন্ত। গণ গোত্র নিয়ে মাথা ঘামায় নি কোনদিন। আর এরা হচ্ছে নিকষ কুলিন। কুলের মুখুটি।

কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, প্রধান কথাও নয়, প্রধান কথা হচ্ছে পূর্ণলক্ষ্মী বিধবা। অবিশ্যি বিধবা ছাড়া প্রেম প্রণয় করবার মত বড়সড় আইবুড়ে মেয়ে আর সেকালে কে পেত বলুন? কিন্তু প্রেম করতেই কি পেয়েছিল যোগেশ্বর? তা তো নয়। যোগেশ্বর শুধু দেবী-প্রতিমার সামনে মুগ্ধ ভক্তের মত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো। সেকালে পরপুরুষের সামনে ঘরের মেয়েদের বেরোবার রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু রাম মুখুজ্যের বৌ ছিল জন্ম-রুগ্ণ, তাই সংসারের যাবতীয় কাজ পূর্ণলক্ষ্মীকেই করতে হত। আর যোগেশ্বর ছিল তখন রাম মুখুজ্যের বাড়ির, কী বলেন আজকাল আপনারা? পেয়িং-গেস্ট না কি? তাই।

প্রথম প্রথম আড়ালে থেকে পরিবেশন করতো পূর্ণলক্ষ্মী, ভাত বেড়ে রেখে ভাইকে ডেকে দিয়ে সরে যেত, কিন্তু ক্রমশ সে ভাবটা শিথিল হয়ে এল। তুই বন্ধু একত্রে খেতে বসে, তুটি ভাত চাইলেও এসে দিতে হয়, একটু জল চাইলেও দিতে হয়।

ঘোমটায় আগাগোড়া দেহটাকে মুড়ে এক পলকে এসে দিয়ে সরে যাওয়া থেকে আস্তে আস্তে পাতের কাছাকাছি বসে পাখা নেড়ে মাছি ওড়ানো পর্যন্ত পৌঁছল, থানের ঘোমটাও কপালের উপর উঠল।

আবার ক্রমশ এমন একটা কর্মকাণ্ডের শাখায় ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল যোগেশ্বর যে, তুই বন্ধুতে একত্রে বসে খাওয়া প্রায় তাকে। দৈবাতের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। বেশির ভাগ দিন একাই খেতে হয় তাকে। সামন্ত আসে, যথারীতি ব্রাহ্মণ বাড়ির মর্যাদা বাঁচিয়ে দালানের একধারে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বসে,

জলের গ্লাস থেকে একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে হাত বুলিয়ে অন্নের প্রতীক্ষা করে। তারপর শুভ্রবাসা আর শুভ্রবর্ণা দেবীমূর্তির হাতে মল্লিকা ফুলের মত শুভ্র অন্নময় পাত্র এসে হাজির হয়। সামন্ত নীরবে খায়, তার পর পিঁড়িটা তুলে দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে চলে যায়। পাতে পিঁপড়ে কাঁদে।

রোজই এই রকম চলে, হঠাৎ একদিন কী যে হল, অর্ধেক ভাত ফেলে উঠে পড়ল সামন্ত। আর সেই পাতের দিকে চেয়ে স্থির প্রতিমার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা ধ্বনি উচ্চারিত হল—সবই তো পড়ে রইল।

যোগেশ্বর হয়তো এইটুকুরই প্রত্যাশা করছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—অবহেলার অন্ন বড় দুঃখের।

—অবহেলা। চমকে মুখ তুলে তাকাল পূর্ণলক্ষ্মী। পূর্ণ দৃষ্টিতে। মাথার ঘোমটা খসে গেল তার। আর সেই এক পলকেই যোগেশ্বরের মধ্যে ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠল।

তবু সে আলোড়ন চেপে সে বলল—খেতে দিয়ে ভিখিরিটাকেও মানুষ জিজ্ঞেস করে, আর কিছু চাই? কিন্তু আমি এমনি হতভাগা—

পূর্ণলক্ষ্মী স্পষ্ট গলায় বলল—আপনি কি আমাদের সমাজ জানেন না?

যোগেশ্বর আবেগের সঙ্গে বলে উঠে—না, জানি না। আমি সমাজের মানুষ নই।

পূর্ণলক্ষ্মী একটু হাসল। বলল—কিন্তু আমি তো সমাজ ছাড়া নই?

যোগেশ্বর হঠাৎ একটা দুঃসাহস করে বসল। বলল—তোমারই বা কিসের সমাজ? তোমার স্বামী আছে না পুত্র আছে? না তিনকুলে কেউ আছে? থাকার মধ্যে তো এই ভাই, যার সংসারে ঝি-বৃত্তি করতে করতে—

বর্ষা বলে ওঠে—'তুমি?' একদিনের আলাপেই তুমি।

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—বয়সে ছোটদের 'আপনি' বলার

রেওয়াজ তখন ছিল না। তুমিই বলল যোগেশ্বর। আর আশ্চর্য, ওদের মনেও হল না, ওরা এই প্রথম কথা বলছে। যেন জন্ম-জন্মান্তর ওদের পরিচয় ছিল।

যোগেশ্বরের কথায় পূর্ণলক্ষ্মী বলল—দাসীবৃত্তির অদেষ্ট নিয়ে যে জন্মেছে তাকে তাই করতে হবে বৈ আর কি হবে?

যোগেশ্বর আরক্ত মুখে বলল—কে বলতে পারে দাসীবৃত্তির অদৃষ্ট কি রাণীগিরির অদৃষ্ট—তার তো পরীক্ষা হয় নি?

—পরীক্ষা আর এ জন্মে কোথা থেকে হবে? পূর্ণলক্ষ্মী মৃদু হেসে বলল—মরে আবার জন্মাতে হবে।

যোগেশ্বর রেগে বলে বসে—মরেই তো আছ।

পূর্ণলক্ষ্মী বলল—বিধাতার মার মানুষের বার। রাগ আর কার ওপর?

যোগেশ্বর রোখ করে বলে—না! মারটা বিধাতার নয়, মানুষের। রামের মুখে সব শুনেছি আমি। বিয়ের দুদিন বাদে ভেদবমি হয়ে মরেছিল তোমার বর, অষ্টমঙ্গলা নাকি কাটে নি তখনও, দশ বছরের মেয়ে তুমি তখন। সেই অবধি—তোমার শুধু-হাত থান-কাপড়। এসব কি বিধাতা করেছে?

পূর্ণলক্ষ্মী অবাক হয়ে বলল—কী আশ্চর্য, বিধাতা নয়তো আবার কে?

—তুমি—মুখ্যু—যোগেশ্বর বলে উঠল—তাই কোন্‌টা মানুষের আর কোন্‌টা ভগবানের বুঝতে পার না। সমাজ যদি এত পাজী না হতো—

পূর্ণলক্ষ্মী আরও অবাক হয়ে বলল—ওমা, সমাজ কি একটা মানুষ?

—একটা মানুষ নয়, অনেকগুলো মানুষ। আর সে মানুষগুলো—

যোগেশ্বরের কথা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে থেকে রামের পরিবার চেঁচিয়ে উঠল—কানের মাথা খেয়ে কোন্ চুলোয় বসে আছ গা ঠাকুরঝি? পাঁচনটা গলায় ঢেলে তেতো মুখে বসে আছি, একটা

সুপুরি-কুচি আনতে এত দেরী ?

পূর্ণলক্ষ্মী পড়ি কি মরি করে চলে গেল। যোগেশ্বরও আস্তে আস্তে সরে এল।···কিন্তু সে তো তখনকার মত।

পূর্ণলক্ষ্মী যেন হঠাৎ এক নতুন জগতের বার্তা শুনল। তার দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী ভগবান নয়, এ যেন এক অদ্ভুত ভয়াবহ কথা। চিরদিন অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়ে এসেছে পূর্ণলক্ষ্মী। সে ধিক্কারটা যে সমাজের প্রাপ্য এমন কথা তো তার জানা ছিল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আবার এক সময় ভাবল পূর্ণলক্ষ্মী, আমার এসব কথা ভাবা পাপ।

ভাবল, আমি বামুনের মেয়ে, আমি বিধবা। ভাবল, দাদার বন্ধু লোকটা নিশ্চয় নষ্টচরিত্র, তাই আমার কাছে এসব কথা বলতে আসে।

প্রতিজ্ঞা করল পূর্ণলক্ষ্মী, কাল থেকে ওর সামনে একা বার হব না। আর যদি তেমন অসুবিধেয় পড়তে হয়, দাদাকে বলব ওর খাওয়াদাওয়ার—অন্য ব্যবস্থা করতে।

ওদিকে যোগেশ্বরের মধ্যেও সেই ভূমিকম্পে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে—

হঠাৎ বর্ষা একটা কূট প্রশ্ন করে বসে। বলে—আচ্ছা, এসব তো বলছেন প্রায় একশো বছর আগের কথা। আপনি কি করে এত জানলেন ? তাছাড়া কে কি ভাবল সে কথা—

শুনেই ভদ্রলোক আবার সেই রকম একটা ভৌতিক হাসি হেসে ওঠেন। সেই হা হা হাসি। যাতে শুধু বুকই কেঁপে ওঠে না। ঘরও কেঁপে ওঠে। দেখি যে কোন্ সময় দুলালটা এসে দরজার কাছে বসেছিল, সে ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে বসে।

ভদ্রলোক বলেন—আমি যে একশো বছর আগের লোক নই, সেটা কি করে জানলেন মা লক্ষ্মী ? আর মনের কথা বোঝা ? সেও—

আমি যদিও যোগেশ্বরের গল্পে কিছুটা আকর্ষিত হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন বিরক্তি প্রকাশ না করে পারলাম না। বিরক্তস্বরেই বললাম—

আপনার কথাবার্তাগুলো একটু রহস্যাচ্ছন্ন।

ভদ্রলোক বললেন—রহস্যাচ্ছন্ন? তা হবে। আমাদের তো সবই আচ্ছন্ন। কিন্তু সে যাক, যোগেশ্বরের ইতিহাসে কি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন? তবে থাক, আমি উঠি।

ভাবলাম, ওঠে তো উঠুক। ওর ওই গা-ছমছমে হাসিটা অসহ্য।

কিন্তু ভেস্তে দিল বর্ষা। সে বলে উঠল—না না, আপনি অন্তত ওই পূর্ণলক্ষ্মীর কাহিনীটা শেষ করুন।

—শেষ করব? আচ্ছা। ভদ্রলোক আবার জুত করে বসেন। বলেন, পূর্ণলক্ষ্মীর কাহিনী দুঃখের কাহিনী। শুনে কষ্টই পাবে। তবু শোন। কেউ শুনছে, আর শুনে 'আহা' করছে, এ জানতে পারলে হয় তো তার আত্মাটা শান্তি পাবে। যোগেশ্বর সেই সময় একটা ডুবোজাহাজ কিনেছে। জলের দরে কিনেছে। আর সেই সূত্র ধরে মা লক্ষ্মী একেবারে ঘট কাঁখে নিয়ে যোগেশ্বরের ঘরে এসে ঢুকেছেন। নাইবার খাবার সময় নেই যোগেশ্বরের। তবু যখন রাম মুখুজ্যের বাড়িতে খেতে আসে, অকারণ দেরী করে এদিক-ওদিক তাকায়, বিনা দরকারে জল চায় নুন চায়। কিন্তু পূর্ণলক্ষ্মী নিজেকে সামলে চলে। ওদিকে আরও পাঁচজন বলতে শুরু করেছে, এই লাখ লাখ টাকা যোগেশ্বরের, আর এখনও সে একটা ভাঙা বাড়িতে পড়ে থাকে, আর তার তিন আনার অংশীদার রাম মুখুজ্যের বাড়িতে পয়সা ধরে দিয়ে খায়। ছি ছি!

কঞ্জুস রাম মুখুজ্যে যোগেশ্বরের টাকাতেই যে সমগ্র সংসার চালাচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কি। কী খেতে পায় যোগেশ্বর! শুধু দুটো ডাল-ভাত।

কিন্তু এসব সদুপদেশে যোগেশ্বরের যেন কিছু এসে যায় না। সে যথারীতি সেই নিজের হাতে পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে। জল ছিটিয়ে মেঝে মুছে অপেক্ষা করে। নীরবে খেয়ে উঠে আসে।

রাম মুখুজ্যে যেদিন উপস্থিত থাকে সেদিন তবু একটু কথাবার্তা জমে। কিন্তু ইদানীং ক্রমশ রামমুখুজ্যে যেন বন্ধুকে এড়িয়ে চলতে

চাইছে। হাস্যপরিহাসেও তেমন জৌলুস নেই। 'খাও খাও' করে পীড়াপীড়ি নেই। যোগেশ্বরের যদি মন অন্যদিকে নিবদ্ধ না থাকতো তাহলে হয়তো বন্ধুর এই পরিবর্তন তার চোখে পড়তো, কিন্তু সে তখন আর এক জগতে থাকে। বন্ধুর পরিবর্তনের কারণ অন্বেষণ করতে চেষ্টা করে না।

কিন্তু কারণ তো আছেই। সেই চিরকালের কারণ। ভাগ্যবন্তের প্রতি অভাগ্যের ঈর্ষা। ডুবোজাহাজখানা কেনবার সময় রাম মুখুজ্যে যোগেশ্বরকে এই বলে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল, টাকাটা একেবারে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং নিজেও সে সেই কথাই বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যোগেশ্বর একরকম নাছোড় হয়েই কিনে ফেলেছিল ভাগ্যের পরীক্ষা করতে। আর একরকম বদান্যতা করেই 'ধার দিচ্ছি' ছুতোয় নিজে টাকা দিয়ে বন্ধুকে দু আনার অংশীদার করে নিয়েছিল।

তার পর যখন সেই ডুবোজাহাজেই যোগেশ্বরের ভাগ্যের জাহাজ ভরে ভেসে উঠল, ভয়ঙ্কর একটা হিংসের জ্বালায় ছটফট করে বেড়াতে লাগল রাম মুখুজ্যে। ইচ্ছে করে খাওয়ার সময়টা একত্র হওয়া এড়াতে লাগল, আর একে ওকে বলে বেড়াতে লাগল—আমার বোন যেন বিনি মাইনের রাঁধুনী। যখন অবস্থায় কুলোত না তখন আমার সংসারে খেয়েছ বেশ করেছ, বন্ধুর কর্তব্য করেছি আমি, কিন্তু এখনও কেন? এখন পয়সা হয়েছে, রাঁধুনী রেখে সংসার চালাও, ইচ্ছে হয় বিয়ে করো, বারো মাস পরের ওপর ঝক্কি দেওয়া কেন!

॥ তিন ॥

এসব কথা পূর্ণলক্ষ্মীরও কানে আসে, কিন্তু সে কোন কথা বলে না। তবে দাদার কৃপণতাটা মাঝে মাঝে তার বড় বেশি অসহ্য লাগে। ভাবে, আশ্চর্য! যে লোকটার পয়সায় এ সংসার চলে যাচ্ছে, তাকে একটু খাওয়া-দাওয়ায় 'বিশেষ' করতে হয় না? এ কী চোখের চামড়াহীন নির্লজ্জতা। আবার ভাবে ওই নির্বোধ লোকটা কি জন্যে এখনও হতভাগার মত এসে রাম মুখুজ্যের দালানের এক কোণে নিজে পিঁড়ি পেতে খেতে বসে, এও আশ্চর্য! মনটা অস্থির হয় পূর্ণলক্ষ্মীর, ইচ্ছে হয় মাছের মুড়োটা, ক্ষীরের বাটিটা, গাওয়া ঘিটুকু, টাটকা দইটুকু পাতের গোড়ায় ধরে দেয়, কিন্তু উপায় কোথা? রান্নার খাটুনিটা তার হাতে, ব্যবস্থাপনা তো তার হাতে নয়। সেদিকে তার ভাজ শরৎশশীর খরদৃষ্টি। বিছানায় পড়ে পড়েই সব খোঁজ রাখে।

আর বিছানায় পড়ে থাকতে হয় বলেই বোধহয় অতবেশী কুচুটে হয়ে উঠেছে। তাই প্রতিদিন তার কাছে হিসেব দাখিল করতে হয় পূর্ণলক্ষ্মীকে, কি কি রাঁধল, গোয়ালার কাছে কত দুধ যোগান নিল। ঘরের গাইটাই বা কবে থেকে দুধ বন্ধ করল, আবার কবে দেওয়া শুরু করল।

হিসেব শোনার পর রোজ একবার করে অসন্তোষ প্রকাশ করে ঘোষণা করবে শরৎশশী, সে বিছানায় পড়ে আছে বলেই তার সংসার উড়ে-পুড়ে যাচ্ছে। পা-টা অবশ বলেই বোধকরি চোখ-কান অত তীক্ষ্ণ শরৎশশীর।

হঠাৎ বর্ষা আবার কথা কয়ে ওঠে। বলে—কিন্তু এই ভেবে আমি আশ্চয্যি না হয়ে পারছি না, অত দিন আগের এসব কথা এত নিখুঁত ভাবে আপনি জানলেন কি করে? ওই যোগেশ্বরের বংশের কেউ হন নাকি আপনি।

ভদ্রলোক গম্ভীরকণ্ঠে আমাকে লক্ষ্য করে বলেন—দেখুন,

আপনারা শর্ত ভাঙছেন। আগেই বলেছি প্রশ্ন করবেন না, প্রশ্ন করলেই আমি ক্ষেপে যাই। আর ক্ষেপে গেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

আমি সামলে নিয়ে বলি—না, মানে আপনি—মানে উনি একটু অবাক হয়ে।...আচ্ছা রাত হয়ে আসছে না? খাওয়াদাওয়া—

ভদ্রলোক হেসে উঠে বলেন—রাত কি মশাই? এই তো সবে সন্ধ্যে গেল। প্রশ্ন করবেন না, দেখবেন গল্প এক দৌড়ে মাইল পার হয়ে যাবে। প্রশ্ন করলেই গল্প খোঁড়াতে থাকে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ওঃ, ওই খাওয়ার কথা। একদিন পূর্ণলক্ষ্মী একটা জোর খাটাল। জেলেনী বাড়িতে এলে, তার কাছে কিছু কৈ মাছ কিনে ফেলল। বলল মাসকাবারে টাকা নিও।

বড় বড় সেই কৈ মাছ কটা পূর্ণলক্ষ্মী বেশ তেল-তেল করে ঝাল রাঁধল। রেখে দিল যোগেশ্বরের জন্যে।

শরৎশশী বিছানায় বসে বসে হুমড়ি খেয়ে ভাত খায়। আর সকাল সকাল খায়। সেদিনও তাই খাচ্ছিল, হঠাৎ হাতটা গুটিয়ে বলে উঠল—ঠাকুরঝি, তখন কৈ মাছ ভাজার গন্ধ পেলাম যেন! কই, পাতে তো দেখছি না।

পূর্ণলক্ষ্মী বলে—গোটাকতক মাত্তর রেঁধেছিলাম। পদ্ম মাছওলিকে আজ অনেকদিন পরে দেখলাম, তাই আহ্লাদে ডাকতে ইচ্ছে হল। পোয়াটাক মাছ সামন্তবাবুর জন্যে রেখেছি।

আধসেরকে পোয়াটাক বলে হাল্কা করতে চাইল সে। কিন্তু হাল্কা হল কি? শরৎশশী চোখ গুলি করে বলল—কেন ঠাকুরঝি, তোমার দাদার বন্ধুটি ছাড়া আর বুঝি কেউ ভাল মাছ খেতে জানে না?

পূর্ণলক্ষ্মীর জিভের আগায় একটা ন্যায্য কথা এসে যাচ্ছিল, তবু সামলে নিয়ে বলল—জানবে না কেন? তবে কিনা আরও মাছ তো সকালে এসে গেছে, তাই ভাবলাম আবার কেন ধার বাড়াই। বাকিতে নিলাম তো—

—বাকিতে? বাকিতে মাছ নিয়েছ তুমি? বাকিতে মাছ নেবার

হঠাৎ এত কি দরকার ছিল শুনি ? ঝেঁজে উঠল শরৎশশী।

সেদিন কে জানে কেন পূর্ণলক্ষ্মীও ঝেঁজে উঠল, যে পূর্ণলক্ষ্মী রাগ ঝাঁজ কাকে বলে জানে না। বলল—দরকার নেই-ই বা কেন বৌ ? যে মানুষটা মুঠো মুঠো টাকা দিচ্ছে সংসারে, তার খাওয়া-দাওয়া একটু—

কথা অবিশ্যি শেষ করতে হল না পূর্ণলক্ষ্মীকে, শরৎশশী বাঁ হাত গালে দিয়ে ছি-ছিক্কার করে উঠল—ধিক্ ধিক্, শত ধিক্ তোমায় ঠাকুরঝি। বিধবা মাগী হয়ে তুমি আসো পরপুরুষের হয়ে ওকালতি করতে। লাজলজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ ?

পূর্ণলক্ষ্মী গুম হয়ে গেল।

কিন্তু শরৎশশী চালিয়েই গেল অনেকক্ষণ ধরে। বলতে লাগল—বিছানায় পড়ে থাকি, তাই মনে করো চোখ কানের মাথা খেয়ে বসে আছি। তা মনে করো না ঠাকুরঝি, ভগবানের কৃপায় ও দুটো খোলাই আছে। ভাইয়ের বন্ধুর জন্যে তোমার ছট্‌ফটানি দেখতে আমার বাকি নেই। আর, সব কিছু বুঝতেও বাকি নেই।

পূর্ণলক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে বলে—কি কি বুঝেছ বল তো বৌ? পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার তাল করছি আমি ?

এর পর আর শরৎশশীর পক্ষে এঁটো হাতের বিচার রাখাও সম্ভব হল না। সে এঁটো হাতখানাই গালে মুখে চড়াতে চড়াতে ধিক্কার দিতে লাগল—গলায় দড়ি ঠাকুরঝি, গলায় দড়ি তোমার। এই কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে কোঁদল করতে এসেছ আমার সঙ্গে ? এই পাপকথাটা মুখ দিয়ে যদি বার করতে পারলে নিজে, ঘরের বার হতেই বা তোমার বাধা কিসের ? ও মাগো, ঘরে নারায়ণশিলা, আকাশে তেত্রিশ কোটি দেবতা, দোরের গোড়ায় জাগ্রত কালী, কেউ একটা বাজ এনে মাথায় ফেলল না তোমার! কেউ জন্মের শোধ বোবা করে দিল না!

—দিল না তো দেখছ। বলে মুখটা কঠিন করে চলে গেল পূর্ণলক্ষ্মী।

সেদিন দুপুরে যোগেশ্বরকে খেতে দিয়ে নিজে থেকেই ঘোমটা সরিয়ে কথা বলল পূর্ণলক্ষ্মী যোগেশ্বরের সঙ্গে।

গম্ভীর মুখেই বলল—আপনার তো এখন অনেক টাকা। লোকজন রেখে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

নিশ্চিন্ত যোগেশ্বরকে হঠাৎ যেন সাপে কামড়াল। সে বিষে নীল হয়ে যাওয়া মুখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আড়ষ্ট হয়ে বলল—হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

—ন্যায্য কথা বলেই বলছি। চিরদিন পরের বাড়িতে দয়ার ভিখিরি হয়ে থাকবেনই বা কেন?

হঠাৎ যোগেশ্বরের মুখের চেহারা বদলে গেল। সেই নীল হয়ে যাওয়া মুখ লালচে হয়ে উঠল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও বলে বসল—ভিখিরি বলেই তো ভিখিরি হয়ে থাকতে চাই।

পূর্ণলক্ষ্মীর কিছুক্ষণের জন্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার পর দাঁতে ঠোঁট কামড়ে আস্তে বলল—যা চাওয়া যায়, সব সময় তা পাওয়া যাবে, এমন কি কথা? তাছাড়া বুদ্ধিসুদ্ধিওলা একটা মানুষ চিরদিন ঠকেই বা চলবেন কেন? এখানে কী খেতে পান? মাস গেলে যত টাকা দেন, তার সিকিও তো—

যোগেশ্বর আবেগে উথলে ছি ছি করে উঠে বলল—আমি কি শুধু ভাল খাওয়ার প্রত্যাশায় এখানে আসি পুনি?

আবেগের বশে পূর্ণলক্ষ্মীর দাদার ডাকা ডাকনামটা ধরেই ডেকে বসল যোগেশ্বর। পুরো নামটা তো জানতোও না। রাম মুখুজ্যে 'পুনি' পুনি' করে—তাই।

নাম ডাকা শুনে পূর্ণ একটু আড়ষ্ট হল, তার পর কেমন একটু কঠিন হেসে বলল—আর কিসের প্রত্যাশায় আসেন তাহলে?

—তুমি কি সে কথা বুঝতে পার না পুনি?

পূর্ণলক্ষ্মী আরও কঠিন হয়ে বলল—না, পারি না। পরপুরুষের মনের খবর রাখি, এত অঢেল সময় আমার নেই। কাল থেকে আপনি অন্য ব্যবস্থা করবেন।

—যদি বলি আর কোন ব্যবস্থা করি এমন ক্ষমতা আমার নেই। বলল যোগেশ্বর সাহস করে। হয়তো কঠিনতার অন্তরালে কোথাও ছিল প্রশ্রয়, হয়তো পূর্ণলক্ষ্মীর মুখ যা বলছিল চোখ তা বলছিল না, তা বুঝতে পেরেছিল তাই এই সাহস।

কিন্তু মুখে পূর্ণলক্ষ্মীর সমান কাঠিন্য। বলল—তাহলে উপোস করুন গে। আমি কারুর চিরকালের রাঁধুনী হতে পারব না।

—বেশ। যোগেশ্বর আহত হয়ে বলল—এইটাই যদি তোমার সত্যি মনের কথা হয়, কাল থেকে আর খেতে আসব না।

—ইস্! একেবারে 'কাল থেকে আর খেতেই আসব না'। একটা কিছু ব্যবস্থা না করে—উপোস করে মরবেন নাকি?

—তাতে তোমার কি? হতভাগা যোগেশ্বর যদি উপোস করেই মরে, জগতে কার কি লোকসান?

কাঠিন্যের ছাপ কখন যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে, সে মুখে ফুটে উঠেছে একটা কৌতুকের আলো।—তা অবিশ্যি লোকসান কারও কিছু নেই। সেই কৌতুকঝরা মুখে বলে পূর্ণলক্ষ্মী—তবু বেষ্টর জীব বলে একটা কথা। তা ছাড়া এতদিন দু-বেলা ভাত বেড়ে সামনে ধরলাম —উপোস করা হচ্ছে শুনলে প্রাণে একটা আপসোস আসবে তো?

—এলে আসবে, না এলে না আসবে। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাব না। মনে মনে জানব, এ হতভাগার ত্রি-জগতে কেউ নেই।

—তা হতভাগা হয়ে থাকবারই বা দরকার কি? একটা বৌ আনলেই হয়।

—বৌ! যোগেশ্বর হঠাৎ বলে বসে—মনের মতন বৌ পাচ্ছি কোথায়?

—ওমা, এতবড় বাংলা দেশে আপনার মনের মতন একটা মেয়ে নেই?

যোগেশ্বর গভীর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বলে—কই আর?

পূর্ণলক্ষ্মী সে দৃষ্টিতে কেঁপে ওঠে। কেমন যেন ভয় পেয়ে বলে—ভাতের থালা কোলে নিয়ে কথায় সময় নষ্ট করে কাজ কি? খান।

—খেতে মন লাগছে না।

—ওমা, সে কি! কেন?

—দেখ, অন্ন অমৃত। কিন্তু সেটা যখন কেবলমাত্র ক্ষিধের ভাত হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে তার ওপর বিতেষ্টা আসে।

পূর্ণলক্ষ্মী হঠাৎ হেসে উঠে বলে—শেষ অবধি কিন্তু ক্ষিধে-তেষ্টারই জয়। বিতেষ্টাকে হার মানতে হয়। আমাকেও তো দৈনিক এক পাথর ভাত নিয়ে বসতে হয়। বিতেষ্টা আসে বলে ত্যাগ দিতে পারি কই?

ওরা যে এতাবৎ কালের মধ্যে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে নি, হঠাৎ আজই প্রথম, একথা আর মনে রইল না ওদের।

ওই হাসিতে আজ যোগেশ্বরের মনের বাঁধ ভাঙল, সে মৃদু গভীর সুরে ডাকে - পুনি!

পুনি আর একবার কেঁপে ওঠে। কথা বলতে পারে না।

—পুনি, এক হিসেবে তুমি তো আইবুড়ো।

পুনি এবার কথা বলল—হিসেব মেলাবার কর্তা আমি আপনি নই।

—হিসেব মেলাবার কর্তা না হই, আমাদের নিজের নিজের জীবনের কর্তা তো? সেই জীবন দুটোকে তো মেলাতে পারি?

কোথায় যেন একটা খড়মের আওয়াজ হয়। কে যেন কোথায় কাশছে।

পূর্ণলক্ষ্মীর বুকটা আর একবার কেঁপে ওঠে অন্য ভয়ে। সেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে ও বলে ওঠে—আপনার তো ভারী সাহস দেখছি! আমার কাছে এসব কথা বলতে আসেন!

যোগেশ্বর আরও গভীর সুরে বলে—তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে বলতে যাব?

—বামুনের ঘরের বিধবার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় সে শিক্ষা আপনার নেই দেখছি। নিন, বাজে কথা বন্ধ করুন। কে কোথা থেকে দেখবে, আর—

যোগেশ্বর আবেগভরে বলে—লোকভয় আমি করি না পুনি। আর আমার কোন মন্দ অভিপ্রায়ও নেই। ঠিক করেছি তোমার দাদা যদি আমাকে কেটে দুখানা করতে আসে, তবু আমি তাকে বলব।

—দাদাকে! দাদাকে কি বলবেন আপনি?

—বলব, আজকাল বিধবা বিয়ের আইন হয়েছে।

হঠাৎ কি হল।—যোগেশ্বরের কথায় ভারী যেন অপমান বোধ হল পূর্ণলক্ষ্মীর। মনে হল যোগেশ্বর ওকে করুণা করছে—মনে হল সেই করুণার বশে এত সাহসী হয়ে উঠেছে যোগেশ্বর। তাই দপ্ করে জ্বলে বলে উঠল—বটে নাকি! তাহলে তো অনেকের অনেক সুবিধে হয়ে গেছে দেখছি। তা শুধু বিধবা বিয়ের আইন হলেই তো চলবে না? বামুন চাঁড়ালের বিয়েরও আইন হওয়া দরকার। সেটাও হয়েছে নিশ্চয়?

যোগেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। এতবড় আঘাতের আশঙ্কা তার ছিল না।

সামন্ত যে চাঁড়াল নয়, তা সে জানে। তবে এও জানে বামুনের চেয়ে অনেক নীচু। কিন্তু ভুলে গিয়েছিল। সেইখানে রূঢ় আঘাত হেনে বড় মর্মান্তিক ভাবে মনে পড়িয়ে দিয়েছে পূর্ণলক্ষ্মী। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল যোগেশ্বর। নিত্য নিয়মের মত আস্তে পিঁড়িটা তুলে নিয়ে দেয়ালে ঠেসিয়ে রাখল, তারপর মুখ তুলে বলল—নিজের ওজন ভুলে কথা কয়েছিলাম। ভালই করলে যে শায়েস্তা করে দিলে। কিন্তু—হ্যাঁ—কিন্তু একটা কথা বলে যাই—আমাকে যে তুমি ভেতরে ভেতরে এত ঘেন্না কর তা স্বপ্নেও জানতাম না বলেই এতখানি আস্পদ্দা প্রকাশ করে বসেছিলাম। পারো তো মুখ্যু চাষা বলে মাপ করো।

দালান থেকে নেমে উঠোনে রাখা শুঁড়তোলা চটিটায় পা গলাল যোগেশ্বর। আর একবার পাথর-বনে-যাওয়া সামনের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল—কাল থেকে তোমার একখানা

ভাতের খাটুনি কমল। অনেক উপদ্রব করেছি এযাবৎ। কিন্তু বিশ্বাস করো, যা করেছি, না বুঝেই করেছি।

কী সর্বনাশ! লোকটা যে চলে যায়! আর বোধকরি চিরকালের মতই।…চলে যাবে! ভরদুপুরে! মুখের বাড়া ভাত ফেলে!

পাষাণ-প্রতিমার মধ্যে সহসা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন আলোড়ন ওঠে। কী করছে ভুলে যায়। বোধকরি টেরই পায় না যে দালান থেকে উঠোনে নেমে এসেছে সে। আর নেমে এসে প্রস্থানোদ্যত একটা মানুষের হাত চেপে ধরেছে। টেরও পায় না কী সে বলছে।

কিন্তু যাকে বলছে, সে শুনতে পায়। ভয়ঙ্কর একটা বিহ্বল অবস্থার মধ্যে থেকেই শুনতে পায়—কালকের কথা কাল হবে। আজ এমন করে মুখের ভাত ফেলে চলে গেলে তো চলবে না।

বিহ্বলতা কাটতে সময় লাগল। যোগেশ্বর ভুলে গেছে তার হাতের ওপর একমুঠো চাঁপার কলি। পূর্ণলক্ষ্মী ভুলে গেছে তার হাতটা পরপুরুষের হাতের উপর। অবশ একখানা দেহের উপরে ঊর্ধ্বমুখী একখানি মুখ, সে মুখে আঁকা একজোড়া চোখ শুধু স্থির হয়ে আছে ঊর্ধ্বশিখা প্রদীপের মত। সেই দীপশিখার দিকে তাকিয়ে থেকে যোগেশ্বর আস্তে বলে—ভাতটাই একমাত্র কথা?

—আর কোন্ কথা বলব বলো?….একটা হতাশ নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল সেই স্তব্ধ দুপুরের ভয়-ভয় করা বাতাসে। সেই নিশ্বাসই সব সত্য স্পষ্ট করে দিল।

—পুনি! চলো আমরা পালাই।

—পালাব!

—ক্ষতি কি? সমাজ সংসার থেকে অনেক দূরে চলে যাই না! ভুলে যাই তুমি বামুন আমি শুদ্দুর। ভুলে যাই তুমি বিধবা, আমি—

কথা শেষ করা হল না। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গ হাসি আছড়ে পড়ল তাদের উপর।—বাঃ ঠাকুরঝি, বেড়ে! বিন্দাবন লীলাটা চালাচ্ছ ভাল!

ধরা হাতটা খসে গেল। দুজনে দুদিকে ছিটকে গিয়ে তাকিয়ে

দেখল, মাঝের ঘরের দরজার কাছে বিকৃত-দেহ পশুর মত একটা প্রাণী কুটিল হাসি মুখে মেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

॥ চার ॥

রাম মুখুজ্যে বলল—তোমাকে আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিলাম। সৎ বলে অন্দরে ঢুকতে দিয়েছিলাম। বিশ্বাসের প্রতিদানটা ভালই দিলে।

যোগেশ্বর মাথা তুলে বলল—কি শাস্তি দেবে দাও। মাথা পেতে নেব।

রাম মুখুজ্যে বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে বলল—তুমি এ তল্লাটের জমিদার, লাখ লাখ টাকার মালিক, আমি চুনোপুঁটি, আমার কি সাধ্যি যে তোমাকে শাস্তি দিই? তবে হ্যাঁ, ক্ষমতা যদি থাকতো, তোমার মত বন্ধুকে চাবকে লাল করে দেশছাড়া করতাম।

যোগেশ্বর প্রথমটা চাবুক না খেয়েই লাল হল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল—বেশ। তুমি না পার, নিজের শাস্তি নিজেই নেব আমি। চাবুকটা না পারি, দেশছাড়া হব। আর আমার সমস্ত জমিজমা আর সমস্ত টাকা তোমাকে দিয়ে যাব।

—আমাকে দিয়ে যাবে! সমস্ত টাকা আর জমি! রাম মুখুজ্যে বিচলিত স্বরে বলে—ছোটলোকের পয়সা হলে এই রকমই হয়। নইলে রাম মুখুজ্যেকে এতখানি ব্যঙ্গ করবার সাহস তোমার হতো না। কিন্তু কলি পূর্ণ হলেও ব্রহ্মণ্য তেজ এখনও বিনষ্ট হয় নি যোগেশ্বর। আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিচ্ছি—

যোগেশ্বর ওর উদ্যত হাতটা চেপে ধরে বলল—তুমি ভুল বুঝছ রাম, আমি ব্যঙ্গ করি নি। সত্যি কথাই বলছি। সামান্য কিছু পথ-খরচা নিয়ে, বাকী সমস্ত লেখাপড়া করে দিয়ে আমি চলে যাব। কিন্তু একেবারে নিঃশর্ত হয়ে নয়। বিনিময় চাই। তার বদলে তোমার কাছে একটা বড় জিনিস চাইব।

রাম মুখুজ্যে ভুরু কুঁচকে তেতো গলায় বলল—আমার কাছে আর তোমার চাইবার কী আছে? আমার সবই তো তোমার দয়ার দান।

—ছিঃ রাম! আজ আমি তোমার কাছে অপরাধী। কিন্তু একদিন আমরা বন্ধু ছিলাম একথা ভুলে যেও না। দয়ার কথা থাক। কিন্তু যে বস্তু তোমার কাছে একটা মাটির ঢেলা মাত্র, আমার কাছে তাই বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য। শুনতে পেয়েছি সেদিনের সেই অপরাধে বোনের হাতের জল খাওয়া ত্যাগ করেছ তোমরা। পরপুরুষের হাত ধরে জাত গেছে তার। বাসনমাজা ঝিয়ের কাজ ছাড়া আর তো তাকে দিয়ে তোমাদের কিছু কাজ হবে না ভাই! তবে কেন আমার যথাসর্বস্বর বদলে তাকে আমায় দাও না?

কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি করে যে রাম মুখুজ্যে নিজেকে সংযত রেখেছিল কে জানে। শেষ হতেই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত ঠিকরে উঠে পায়ের খড়ম খুলে উঁচিয়ে বলল—তবে রে পাষণ্ড! পয়সার গরমে তুই এত বড় কথা বলতে সাহস পাস? তোর ওই মুখে কুষ্ঠব্যাধি হোক, ওই জিভ খসে পড়ুক। তুই চলৎশক্তিহীন হয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াগে। তোর চোখ যাক কান যাক—

যোগেশ্বর একটা বিচিত্র হাসি হেসে বলল—বুঝেছি, যে পাপ প্রস্তাব আমি করেছি, তোমাদের সমাজের নিয়মে ওই সব শাস্তিই আমার হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর জানেন পাপ কি পুণ্যি! ধর্ম কি অধর্ম! যাক্, তবু তোমায় একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

কথা চলছিল মাঠের মাঝখানে পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে।

রাম মুখুজ্যে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। দেখল যতদূর চোখ যায় সমস্ত জমি যোগেশ্বরের। চোখের বাইরেও আরও কত। লোভের তাড়নায় বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে এল তার, খড়মসুদ্ধু হাতটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। গম্ভীর ভাবে বলল—আচ্ছা তুমি যখন বলছ, ভেবেই দেখব। এ শুধু তুমি অনেক দিনের বন্ধু বলেই। আর কেউ হলে—

আর কেউ হলে কি করত রাম মুখুজ্যে, সেটা আর না বলেই চলে গেল খড়ম খট্‌খটিয়ে। যোগেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

॥ পাঁচ ॥

সারাদিন ধরে শরৎশশীর সঙ্গে পরামর্শ চলল রাম মুখুজ্যের। লোভের কাছে পরাস্ত হচ্ছে মিথ্যা অহমিকা।

ভয়ঙ্কর লোভ।

দুর্নিবার লোভ। যার কাছে লোকলজ্জা, চক্ষুলজ্জা, ধর্মভয়, সবই তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়।

যোগেশ্বরকে আর কেউ না চিনুক, রাম মুখুজ্যে চেনে। জানে তার কথার নড়চড় হবে না। সে যা সত্য করেছে, সে সত্য পালন করবে। যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেই চলে যাবে। শুধু তার বদলে নিয়ে যাবে ওই মাটির ঢেলাটা। অবিশ্যি ওই ঢেলাটা বিহনে কিছু অসুবিধে হবে রাম মুখুজ্যের, কিন্তু সে অসুবিধে পূরণের ভার তো শরৎশশী নিতে চাইছে। বলছে—তোমার বোন ঘাঁটি আগলে বসে আছে, তাই আমার বোনকে আনতে পারি না। নইলে আমারই কি বিধবা বোন নেই? বড় ছোট দু-দুটো রয়েছে। তারা এলে বরং আমায় দরদ দিয়ে সেবা করবে। তোমার বোনের মতন মুখনাড়া দিয়ে করবে না।

শরৎশশীর প্রস্তাবে রাম মুখুজ্যের মনটা আর একটু দুলে উঠল। মন্দ কি! বিধবা বোনের চাইতে বিধবা শালী বরং অনেক গুণে সরেস। বোনের কাছে শুধুই ভাত-জলের প্রত্যাশা। শালীর কাছে উপরি আয় হাসিটা মস্করাটা। রংটা, রসটা।

এদিকে মাটির ঢেলার মূল্যে রাজ-ঐশ্বর্য!

বাধা? বাধা শুধু ধর্মভয় আর চক্ষুলজ্জা।

কিন্তু সে বাধা নস্যাৎ করে দেয় শরৎশশী। বলে—ধর্মভয়ের কথা

আর চিন্তা করো না। ধর্ম তো সে নিজেই খুইয়ে বসে আছে। এটা নিতান্ত উঠোনের মাঝখানে, তাই আমার চোখে পড়ল। রান্নাঘরে ভাত খাবার সময় ঘোমটার ভেতর কত খ্যামটা নাচ হয় কে জানে। হাত ধরা তো ছোট কথা, সেখানে গলা ধরলেই বা দেখতে যাচ্ছে কে? আর চক্ষুলজ্জা? তার জবাব তো হয়েই আছে। বলবে বন্ধুকে, ভেবে দেখলাম, তুমি যখন ওকে ধর্মে পতিত করেইছ, তখন আমার সংসারে ও পাপের জড় না রাখাই ভাল। তাছাড়া আমি এই তোমাকেও বলে দিচ্ছি, ওই কালামুখীর হাতের ভাত-জল আমি খাব না। পাঁচদিন নয় তুমি স্বপাকে খেলে, বার মাস পারবে আমাকে ভাত জল দিতে? এখন তো সংসারে ও থাকা আর বাগদী ঝিটা থাকা সমান।

রাম মুখুজ্যে তবু দ্বিধাগ্রস্ত। বলে—ভাবছি, লোকলজ্জারও একটা জবাব আছে। টের পেয়ে লোকে আমায় পতিত করবে না? গায়ে ধুলো দিয়ে বলবে না—বোন বেচে বড়লোক হয়েছে রাম মুখুজ্যে!

—আঃ, কী আশ্চয্যি! এ কি তুমি ঢাক পিটিয়ে করবে? রাতারাতি রটিয়ে দেবে ভেদবমি হয়ে মরেছে।

রাম মুখুজ্যে চমকে ওঠে। হঠাৎ যেন কোন এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা দেখতে পায়। আর ভয়ানক একটা চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ চিন্তার ভাগ সে শরৎশশীকেও দেয় না।

দেওয়া সম্ভব নয় বলেই দেয় না। শুধু চোখ দুটো তার জ্বলতে থাকে সাপের চোখের মত। বাঘের চোখের মত। পেয়েছে—অন্ধকারে পথ পেয়েছে রাম মুখুজ্যে। সাপ মরবে, লাঠি ভাঙবে না।

ভাবতে ভাবতে কদিনে কী রকম যেন হয়ে যায় রাম মুখুজ্যে। একটা পাতা নড়ার শব্দ হলে চমকে ওঠে। ধর্ম আর অধর্ম, পাপ আর পুণ্য, এর মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বসে মনে মনে। আর সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্যে জগতের অন্ত অধর্ম করা ঠিক কি না তার মীমাংসা করে ফেলে।

॥ ছয় ॥

অবশেষে দিন তিনেক পরে যোগেশ্বরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল রাম মুখুজ্যে। বলল—ভেবে দেখলাম, ও যখন ধর্মই হারিয়েছে—তখন আর ওকে ঘরে রেখে বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করি কেন। তোমার হাতেই তুলে দেব ওকে।

—রাম! দুই হাতে বন্ধুর হাতটা চেপে ধরে যোগেশ্বর। আবেগপূর্ণ স্বরে বলে—ভাই, তুমি আমাকে যা দিলে তার জন্যে যে কী ভাষায় তোমায়—

রাম মুখুজ্যে বাধা দিয়ে নীরস স্বরে বলল—ভাষা নিয়ে আর কী হবে? যেটা আশা দিয়েছিলে সেটা যেন আবার—

—কী আশ্চর্য! কী বলছ তুমি রাম? যোগেশ্বর দুর্বল চরিত্র হতে পারে কিন্তু জোচ্চোর নয়। আমি কালই উকিল ডেকে পরামর্শ করে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র করে দেব। আর তুমি আমাকে যতই পাষণ্ড ভেবে থাক, বিশ্বাস করো, ওকে নষ্ট আমি করব না। দুজনে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে নাম লেখাব, তারপর আচার্যর সামনে ব্রাহ্মমতে বিয়ে—

রাম মুখুজ্যে নীরস স্বরে বলে—বেম্ম মতে বিয়ে করো, আর মোছলমান মতে নিকে করো, আমার কাছে দুই সমান। তবে উইলটা যেন পাকা হয়। আমি প্রোবেট নিয়ে তবে—

এসব কথা এখন আর শরৎশশীও টের পায় না। জগতের কাউকে আর এখন বিশ্বাস করবে না রাম মুখুজ্যে।

শরৎশশী বলে—দেখো, চিন্তে করে দেখছি ঝট করে মৃত্যু-খবর রটনাটা ঝঞ্চাট। পাড়ার পাঁচজনে বলতে শুরু করবে কখন মরল, কে মুখাগ্নি করল, কারা শ্মশানে নিয়ে গেল। তার চেয়ে বলে বেড়াও, ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্দিশ করেছে। লোকাভাব, তাই কন্না করতে নিয়ে যেতে চায়, তারপর একদিন লোকে জানবে সন্ধ্যের এসে ভোরে

নিয়ে গেছে তারা। কিছুদিন বাদ তখন বরং—

'তখন বরং' কি? সেটা আপাতত উহ্য রাখে শরৎশশী।

রাম মুখুজ্যে কিন্তু ওর এই যখন-তখন পরামর্শে অতিষ্ঠ হয়ে বলে —বলি মাঝখানের বস্তুটা তো আর সত্যি ঢিল পাথর নয়? আমরা যা বলে বেড়াব, সে তার প্রতিবাদ করবে না?

—প্রতিবাদ! শরৎশশী মুখ বাঁকিয়ে হাসে। হেসে বলে—সে বলে মনে মনে ফুলের মালা গাঁথছে। যাতে হোক রাজী হবে। তোমার বোন কি আর নিজেতে আছে গো? সেদিন অবধি বাতাসে ভাসছে। এই যে আমরা ওর হাতে খাচ্ছি না তার জন্যে কি একবার কেঁদে এসে পড়েছে? না হাতে-পায়ে ধরেছে? আমি তো ভেবেছিলাম, তেমন আকিঞ্চন করে, গোবর খাইয়ে, প্রাচিত্তির করিয়ে হেঁসেলে ঢুকতে দেব। ও হরি! এ যেন দেখছি বেঁচেছে, হাড়ে বাতাস লেগেছে। রাতদিন নিজের ঘরটিতে পড়ে আছে, শুচ্ছে বসছে, গালে হাত দিয়ে ভালবাসার মানুষের কথা ভাবছে—

—থাক থাক। রাম মুখুজ্যে বিরক্ত হয়ে বলে—রাখো তোমার ওসব মেয়েলি কথা। বলি রাঁধছে খাচ্ছে না?

—কে জানে! শরৎশশী ঠোঁট উল্টে বলে—কই, সাড়া শব্দ তো পাই না।

—তা একবার খোঁজটোঁজ করো না?

—আহা গো, ভারী আমার সুহৃৎ এলেন! ঝেঁজে ওঠে শরৎশশী, —আমার কে খোঁজ নেয় তার ঠিক নেই। বাগানের আম কাঁটাল তো পেকেছে। ঘরে মুড়ি-চিঁড়েরও অভাব নেই, নিশ্চয় তাই সাঁটছে বসে বসে।

রাম মুখুজ্যে একবার ভাবল বোনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে। তারপর ভাবল, থাক, এখন নাড়াচাড়ায় কাজ নেই। ওদিকের কার্যোদ্ধারটা হয়ে যাক।

তা ওদিকের কার্যোদ্ধার হতে দেরী হল না।

যোগেশ্বর নিজের গরজেই এগিয়ে আনল। আর যেদিন দানপত্র

লেখানো শেষ করল, সেদিন এক আকস্মিক সৌভাগ্যের বশে পূর্ণলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। ভোরবেলা ঘাট থেকে স্নান করে ফিরছিল পূর্ণ, আর যোগেশ্বর স্নান করতে আসছে। কোনদিন আসে না, আর এ পুকুরেও আসে না। কি মনে করে আজই হঠাৎ—

বিমুগ্ধ বিহ্বল যোগেশ্বর বলল—তুমি এখন ?

পূর্ণ গামছাখানা আরও ভাল করে টেনেটুনে গায়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বলল—আমি তো রোজই এ সময় চান করতে আসি।

—রোজ ?

—হ্যাঁ।

যোগেশ্বরের মনে হল, উঃ, দিনের পর দিন কত বড় একটা লোকসান হয়ে গেছে তার। ও বাড়িতে ভাত খাওয়া ছাড়া অবধি একদিনের জন্যে তো চক্ষে দেখতে পায় নি পুনিকে। তাই বলল—ইস !

—ইস কিসে ?

—জানলে রোজ শেষ রাত থেকে উঠে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

—আপনি কি পাগল ?

—তা একরকম তাই বৈকি। পুনি, রাম তোমায় সব বলেছে ?

—দাদা! পূর্ণলক্ষ্মী চকিত হয়ে বলে—কী বলবে দাদা ?

—ও বুঝেছি, বলে নি।

যোগেশ্বর বোঝে, টাকার বিনিময়ে বিধবা বোনকে শূদ্রের হাতে তুলে দেওয়ার কথা রাম মুখুজ্যে বোধহয় এখনও মুখ ফুটে বলতে পারে নি। ঈশ্বরের অপার দয়া, তাই আজ দেখা হয়ে গেল। আবার ভাবল, কি জানি, মেয়েমানুষের লজ্জা, হয়তো জেনেও না জানার ভান করছে। কিন্তু লেনদেনের কথাটা যোগেশ্বরই কি বলবে ? কী দরকার। যদি পুনি রেগে বলে, ও, আমি তাহলে বাজারের মাল! তাই টাকা দিয়ে কিনতে চাও আমায়? তার চাইতে বরং শুধু আকুলতা, শুধু কাকুতি-মিনতির জোরে চেয়ে নিচ্ছে তাকে যোগেশ্বর, এটাই ভাল। তাই আবার বলে—তোমার দাদার হাতে-পায়ে পড়ে

মত করিয়েছি আমি। ব্রাহ্মমতে আমাদের বিয়েতে রামের আপত্তি নেই—

—সরুন, পথ ছাড়ুন। আপনি দেখছি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। বলে ঝেঁজে ওঠে পূর্ণলক্ষ্মী। কিন্তু চলে যায় না। পথের অভাব না থাকলেও যায় না।

যোগেশ্বর এ প্রশ্রয়ের সুযোগ নেয়। বলে—শোন, পাগলামি নয়। তুমি আমায় শুদ্দুর বলে যতই ঘেন্না কর, আমি তোমাকে নইলে বাঁচব না! ব্রাহ্মধর্ম বলে যে নতুন ধর্ম হয়েছে, সে ধর্ম খুব উদার। আর আমাদের মতন হতভাগ্যের বন্ধু। আমরা দুজনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলে বামুন শুদ্দুর বলে এত তফাত থাকবে না। বিধবাতেও দোষ হবে না। কাজেই বিয়ের আর কোন বাধা থাকবে না।

পূর্ণলক্ষ্মী একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। দেখল ভোরের অরুণ আলো এসে লেগেছে যোগেশ্বরের দীর্ঘোন্নত গৌর দেহের উপর। কোঁকড়ানো চুলে ঘেরা মুখে যেন দেবতার লাবণ্য, আর দুটি চোখ! ওই প্রেমে বিহ্বল, আবেগে ঢল ঢল চোখ দুটি কিনা রাম মুখুজ্যের ঘরের ঝি রাঁধুনী ঘুঁটেকুড়ুনী পুনির একটু প্রসাদ ভিক্ষা পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে! ধর্ম? এই মানুষটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়াই ধর্ম?

নিজের স্বামীকে কি কোনদিন চোখে দেখেছে পূর্ণলক্ষ্মী? বিয়ে হয়েছিল কিনা তাই তো মনে করতে পারে না।

জাত? সে তো বিনা অপরাধেই গিয়ে বসে আছে। 'পতিত' হয়ে পড়ে আছে তো সে এখন। এ অবস্থাতেই বা কী ভাবে টেঁকা যায়?

আগে তবু শরৎশশী শুধু ঠেস দিয়ে কথা বলেই মনের গলদ কাটাত। এখন তার হাতে ধারালো অস্ত্র, কি হাত অপমান করবে সে ননদকে। পরপুরুষের হাত ধরার কথা তুলবে। সেই ভাবে তাকে, ধর্ম আর জাত, যাতে নাকি আর তার অধিকার নেই, তাকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে হবে দাদার বাড়ির পাঁশগদায়।

সেই ধিক্‌কৃত জীবন, আর সামনের ওই দেবতার আশ্রয়।

সে জীবন তো মৃত্যু আর নরক।

একদিকে আলো আকাশ স্বর্গ প্রেম আনন্দ জীবন। অন্যদিকে অন্ধকার পাতাল নরক লাঞ্ছনা দুঃখ মৃত্যু। কোন্‌টাকে বেছে নেবে পূর্ণলক্ষ্মী?

ব্রাহ্মধর্মটাও নাকি ধর্ম! মহা মহা পণ্ডিতরা নাকি এ ধর্মকে গড়েছেন। তবে দোষ কি তাঁদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলে? মুখুজ্যে বংশের পরিচয় মুছে দিয়ে পূর্ণলক্ষ্মী যদি সামন্ত বংশেরই একজন হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, কী ক্ষতি পৃথিবীর? আজ যদি এক্ষুনি মরে পূর্ণ, কালই তো কোনও হাড়ি ডোমের ঘরে গিয়ে জন্মাতে পারে। আর তাই তো জন্মাবে। বামুনের বিধবা হয়ে এসব চিন্তাকে যখন মন থেকে তাড়াতে পারছে না, তখন আত্মা তো নিম্নগামী হবেই। তবে এই দেহটাতেই জন্মান্তর ঘটুক না পূর্ণলক্ষ্মীর।

অত কি ভাবছ পুনি? তোমার দাদার জন্যে ভেবো না। তার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব। বাকী জীবন যাতে তাকে খেটে খেতে—

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা শেষ করে যোগেশ্বর—তোমাকে ঘরে পেলে আমার কুঁড়েই স্বর্গ হবে। একবার শুধু প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দাও পুনি।

কিন্তু মুখ ফুটে কি আর অনুমতি দিতে পারে মেয়েমানুষ? পারে না। তবু মুখে ফুটে ওঠে সে অনুমতি। ফুটে ওঠে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দুই চোখের গভীর দৃষ্টিতে।

কতক্ষণ দুজনে অমনি চুপ করে চেয়ে ছিল কে জানে। একসময় যোগেশ্বর বলল—ইস, তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকোল। যাও যাও। কিন্তু মনে রেখো, আশায় নৈরাশ করো না। তা যদি হয়, জেনো এই পুকুরেই এই যোগেশ্বর সামন্তর লাশ ভেসে উঠবে।

পূর্ণলক্ষ্মী শিউরে উঠে বলে—কি বলছ, ছিঃ!

তা হলে জানলাম তুমি আমার হবে।

পূর্ণলক্ষ্মী মুখ তুলে একটু হাসল। বলল—হওয়াতে বাকী রেখেছ নাকি?

আহ্লাদে বিগলিত হয়ে উঠল যোগেশ্বর, উছলে উঠল। বলল—পুনি!

—কি?

—কিছু না। এমনি। কিন্তু তোমাকে শুধু পুনি বলেই ডাকি। পুরো নামটা কি তোমার?

—আমার নাম? আমার হচ্ছে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। নাম পূর্ণলক্ষ্মী। জগতের সেরা অলক্ষ্মী কিনা।

—কক্ষনও না। যোগেশ্বর গর্জে ওঠে—চিরলক্ষ্মী তুমি। আমার ঘরে গিয়ে তোমার নাম সার্থক হয়ে উঠবে। ঘরের লক্ষ্মী হয়ে ঘর পূর্ণ করে তুলবে।

—ভেবে ভয় করছে।

—ভয় কি? সকল ভয়ের ভরসা ভগবানকে তো আমরা ছাড়ছি না পূর্ণলক্ষ্মী!

॥ সাত ॥

বাড়ি গিয়ে যখন ঢুকল পূর্ণলক্ষ্মী, তখন সত্যিই তার গায়ের ভিজে কাপড় শুকিয়ে গেছে। দেখল উঠোনের কোলে রোদ নেমেছে।

বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কে জানে মুখেও তার চিহ্ন ধরা দিচ্ছে কি না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ল, আর তাড়াতাড়ি পুজোর আসনটা পেতে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ তবু সময় পাওয়া যাবে বুকের ধাক্কা স্থির করতে। আর দাদাও হয়তো ঘুম থেকে উঠে ভাববে, পুনি যথাসময়েই ঘাট থেকে ফিরে পুজোয় বসেছে।

কিন্তু কে জানে কেন আজ সকলেরই ত্বরা। রাম মুখুজ্যেও উঠেছে অনেকক্ষণ। বোনের দীর্ঘ অনুপস্থিতি চোখে পড়েছে তার। চোখে

পড়েছে তার আরক্তিম মুখ। সন্দেহে মুখ কুটিল হয়ে উঠেছে তার। ব্যাপার বুঝতে দেরী হয় নি। আর বুঝেছে, যোগেশ্বরের প্রস্তাব ব্যর্থ হবে না পূর্ণলক্ষ্মীর কাছে।

কিন্তু রাম মুখুজ্যে আর এক চাল চালবে। লাঠি না ভেঙে সাপ মারবে। জাত না খুইয়ে পেট ভরাবে। পাতক দিয়ে পুণ্যি কিনবে।

খানিক পরে খড়ম খটখটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যোগেশ্বরকে ধরল।

—কি হল সেটার ?

যোগেশ্বর তখন বাতাসে ভাসছে। সকাল থেকে তার মনের মধ্যে এক অপূর্ব সুর বাজছে। কৃতার্থধন্য হয়ে বলল—এই তো ভাই, সবই প্রস্তুত। আজই দানপত্র নিয়ে তোমার কাছে যাব।

—না না, তোমার যাবার দরকার নেই, আমিই আসব। কিন্তু সাক্ষীসাবুদ ?

যোগেশ্বর বলল—সাক্ষী ভগবান। ব্যাপারটা গোপনীয়, বাইরের কাকে আর ডাকব ? তবে তুমিও আমাকে ঠকাবে না, আমিও তোমাকে ঠকাব না, এটা তো ঠিক ? দলিল-পত্তরগুলো বুঝে নিয়ে তুমি অবিশ্যিই পুনিকে—

রাম মুখুজ্যে ভুরু কুঁচকে বলল—উঁহু, বলেছি তো প্রোবেট নিয়ে তবে—যতই বন্ধু থাক, বিষয় বড় পাজী জিনিস। পাকাপাকি না হওয়া পর্যন্ত—

যোগেশ্বর নিশ্বাস ফেলে বলল—বেশ। কিন্তু এই কটা দিন দৈনিক একবার করে দেখা করবার অনুমতি দাও—

—কেন, আবার ওসব ঝামেলা কেন ? রাম মুখুজ্যে বলে—কোথা থেকে পাঁচ-কান হবে। সমাজে আর বাস করতে হবে না তাহলে আমাকে। ও একেবারে সেইদিনই ! এত অধৈর্য। ছিঃ !

যোগেশ্বর আরও গভীরতর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—না, ভাবছিলাম দীক্ষা নিতে হলে দস্তখৎ করতে হয়। তাই পুনিকে এই ক'দিনে একটু শিখিয়ে—

রাম মুখুজ্যে গম্ভীর ভাবে বলে—পুনি কি নাম দস্তখৎ করতে

পারে না ?

—পারে ? দস্তখৎ করতে পারে ?

—নিশ্চয় ! বলে রামায়ণ মহাভারত সীতার বনবাস ছিষ্টি পড়ে শেষ করেছে।

—অ্যাঁ। রাম, তোমার ঘরে কী রত্ন অবহেলায় পড়ে আছে, যদি জানতে।

রাম গম্ভীর ভাবে বলে—অবহেলায়, এ কথা কেন ভাবছ যোগেশ্বর। বিধবা বোনকে যেমন স্নেহ সম্মান দিতে হয়, তাই দিয়েই রেখেছি তাকে। তবে সে যে মনে মনে ঘর-বর চাইছে সে খবর আর কেমন করে জানব বলো।

যোগেশ্বর ব্যাকুল ভাবে বলে—ও কথা ভেবো না রাম। তার কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। সে স্বর্গের দেবী !

—হুঁ। বলে চলে গেল রাম মুখুজ্যে।

॥ আট ॥

বাড়ি গিয়েই সেই নামেই ডাকল পুনিকে। বলল—রাতারাতি যে তুমি স্বর্গের দেবী হয়ে উঠেছ তা তো জানি না। যাক ভালই কথা। আমরা নরকের কীট, আমাদের নানান চিন্তা। তবে একটা কথা শুনে রাখো, যোগেশ্বর বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইছে। বেহ্মমতে তোমায়—পাপ কথা উচ্চারণ করতেও জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবু করতে হবে—তোমায় বিয়ে করতে চায়। আর আমি যদি তাতে রাজি না হই, আমায় ভিটে-মাটি চাটি করে ধ্বংস করবে।

পূর্ণলক্ষ্মী চমকে উঠে বলল—কক্ষনো না। এমন কথা কখনও বলতে পারেন না তিনি।

—'তিনি' কি বলতে পারেন আর না পারেন সবই তুমি জেনে বসে আছ দেখছি যে ! তবে আমিই বানাচ্ছি—রাম ব্যাজার মুখে

বলে—বদলোকে অনেক চাতুরী জানে। মেয়েমানুষের মন ভোলাতে ওস্তাদ হয়। কিন্তু মুখোশ খুলে পড়তে দেরী হয় না। এখন বুঝে দেখ তুমি কী করবে?

—দাদা! পূর্ণলক্ষ্মী কাতর আক্ষেপে শুধু ডেকে উঠল, আর কিছু বলতে পারল না। রাম মুখুজ্যে ফের বলল—দাদা কিছু বলবে না। দাদার একদিকে প্রাণ আর একদিকে কুল-মান সুতোয় ঝুলছে। এখন তুমি দেখ কুল-মান-ধর্ম সব বজায় রেখে ভাইকে বাঁচাবে, না কুলে কালি দিয়ে শুদ্দুরের ছেলের হাত ধরে নিকে করতে বেরিয়ে যাবে?

রাম মুখুজ্যের কণ্ঠ থেকে যেন একটা ক্লেদাক্ত নিষ্ঠুরতা ঝরে পড়ে।

পূর্ণলক্ষ্মী এবার মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বলে—দাদা, তোমার বন্ধুকে তুমি যত জানো, আমি তত নয়, তবুও আমার বিশ্বাস তোমার কিছু ভুল হচ্ছে। এমন কথা উনি বলতেই পারেন না। তোমাকে ভিটে-মাটি চাটি করে—

—বলতেই পারেন না? ওঃ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! 'বলতেই পারেন না।' তো আমিই বানিয়ে বলছি সেইটাই ঠিক।

—দাদা, আমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করব।

—দেখা করবে? সত্যি মিথ্যে যাচাই করবে? রাম মুখুজ্যে বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে বলে—তা তার জন্যে আমার অনুমতি লাগবে বুঝি? দেখা করতে কসুর করছ নাকি? ঘাটে পথে কোথায় না দেখা করছ? আমি কেবল লোক জানাজানির ভয়ে চুপ করে থাকি। কিন্তু মনে রাখিস পুনি, ইহকালই সব নয়, পরকাল আছে। মনে রাখিস, আমাদের এই দেশের মেয়েরাই ধর্ম বজায় রাখতে হাসতে হাসতে জহরব্রত করেছে, বিষপান করেছে। আর এও মনে রাখিস, আজ যোগেশ্বরও মোছলমান নবাব-বাদশার চেয়ে কিছু কম অত্যাচার করছে না। পয়সার গরমে বামুনের বিধবার দিকে কুদৃষ্টি দিচ্ছে। কি বলব পুনি, প্রাণীহত্যে মহাপাপ। নইলে তোকে আমি গলা টিপে মেরে চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ হওয়া থেকে উদ্ধার করতাম। আর তার পর ওই দুশ্চরিত্র বদমাসটার কাছে গিয়ে বলতাম—নে, এইবার

আমার কি করবি কর্। কিন্তু প্রাণীহত্যেটা আর করতে চাই না।

—দাদা! পূর্ণলক্ষ্মী এততেও বলে—আমি একবার তোমার সামনেই ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করব, এ খবর ঠিক কি না। তার পর—

রাম মুখুজ্যে ঘেন্না প্রকাশের চরম নিদর্শন খানিকটা থুতু ফেলে বলে—গোল্লায় যা পুনি, গোল্লায় যা। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। লজ্জা করল না আমার সামনে এইসব নাটক করতে? আমি যদি তুই হতাম পুনি, তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে পিতৃ-পিতামহর বংশকে কলুষের হাত থেকে রক্ষে করতাম। মেয়েমানুষের আত্মসুখ! ছি!

খড়ম খটখটিয়ে চলে যায় রাম মুখুজ্যে বোনকে আর দ্বিতীয় কথা কইবার অবকাশ না দিয়ে। আর পূর্ণলক্ষ্মী? তার কথা এখন থাক।

॥ নয় ॥

তা যোগেশ্বরের অবস্থাও বর্ণনার অতীত। সে যে কি করে দুটো দিন নিজেকে আটকে রেখেছে তা সে-ই জানে।

এই দুটো দিন মনকে ব্যাপৃত রাখতে সে তার যত প্রজা আছে সবাইয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখা করল, আর বলতে লাগল আমি তীর্থে যাচ্ছি ভাই, এখন ভগবান জানেন ফিরি কি না ফিরি।

সবাই অস্থির হয়ে বলল—সে কি বাবু! ও কথা বলবেন না। আপনি গরীবের মা বাপ! কিন্তু এখন এই ভরা বয়সে কোথায় বে-থা করে সংসারী হবেন, তা নয় তীর্থে?

যোগেশ্বর হাসল।

—আমাদের কার হাতে রেখে যাচ্ছেন বাবু?

—রামবাবু রইলেন।

—রামবাবু! ওরা মুখ বাঁকাল।

অবশেষে যোগেশ্বর রামকে ধরল—সব বুঝে-পড়ে নিয়েছ রাম ?

—হয়েছে একরকম। তা তোমার মাল চালানের ব্যবসাটা ?

—ওটা রইল। ভাবছি খিদিরপুরের দিকেই থাকব।

—কিন্তু মনে রেখো আমার সঙ্গে যেন আর জীবনে দেখা না হয়।

যোগেশ্বর কাতর ভাবে বলল—রাম, তুমি আমার উপর রাগ করে থাকলে যে আমার সব সুখই বৃথা।

রাম বলল—রাগের কথা নয়। লজ্জার কথা। তোমায় দেখলেই আমার মনে পড়ে যাবে আমি বোন বেচে বড়লোক হয়েছি।

—ও কথা কেন বলছ রাম ? বন্ধুকে তো বন্ধু উপহার দেয়। আমিও না হয় তাই দিচ্ছি তোমায়।

—হুঁ।

—তাহলে আজই যাচ্ছি তো ?

—হুঁ। কিন্তু মনে রেখো রাতের অন্ধকারে। প্রকাশ না হয়। কাল আমি পাড়ার পাঁচজনকে বলব ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে গেছে।

—তোমায় কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব রাম। আমি সবাইকে জানিয়েছি তীর্থে যাচ্ছি। তুমিও সেইমত জানাবে, বুঝেছ ?

—হুঁ।

—তাহলে রাত্রে আসছি।—আমি 'সমাজে' গিয়ে একজন আচার্যের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি খুব উৎসাহ দিয়েছেন। যে ক'দিন না বিয়ে হয় তাঁর বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে রাখতে বলেছেন পুনিকে। খুব ভাল জায়গা—

রাম ব্যাজার মুখে বলে—পুনিকে নিয়ে গিয়ে তুমি জাহান্নমে রাখবে কি নরকে রাখবে, সে খবরে আমার দরকার নেই যোগেশ্বর। সন্ধ্যে পার করে এসো। ব্যস। তবে পুনি তো সেই সকাল থেকে দোরে খিল দিয়ে বসে আছে।

—দোরে খিল দিয়ে! যোগেশ্বর অবাক মুখে বলে—কেন ?

—কেন আর! চক্ষুলজ্জা! যতই হোক হিন্দুর মেয়ে তো!

—আমি গেলে খুলবে তো? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে যোগেশ্বর।

রাম মুখুজ্যে কেমন একরকম হেসে বলে—না খোলে দোর ভাঙতে হবে।

হ্যাঁ, দোর ভাঙতেই হল।

আশা আর আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে নতুন ধুতি চাদর আর নতুন কোট গায়ে দিয়ে যোগেশ্বর যখন একেবারে পালকি নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, তখনও পুনির ঘরের দরজা বন্ধ।

রাম মুখুজ্যে উদ্বিগ্ন মুখে বলে—আমি তো ভাই ডেকে ডেকে হার মেনে গেছি, দোরও খোলে না, সাড়াও দেয় না। এখন দেখ, যদি তুমি পার।

—ওদিকে জানলা নেই? কাতর গলায় বলে যোগেশ্বর।

—আছে, পিছন দিকে জানলা আছে, সেও ভেতর থেকে বন্ধ।

যোগেশ্বর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকলজ্জা ভুলে ডাক দেয়—পুনি, পুনি! পূর্ণ, আমি পালকি নিয়ে এসেছি।

কিন্তু কোথায় পুনি! কে জানে আরও কোন্ শক্তিমান বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোন্ পালকিতে চড়ে কোথায় রওনা দিয়েছে সে!

শেষ পর্যন্ত দরজা ভাঙতেই হয়। শাবলের চাড় দিয়ে। রাম মুখুজ্যেই খোলে, তোড়জোড় করে শাবল এনে। এবং যে মুহূর্তে দরজা খুলে পড়ে, সেই মুহূর্তেই যোগেশ্বর ভয়ানক একটা আর্তনাদ করে ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে। আর যেন সমস্ত পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়ে আড়ার নীচে থেকে ঝুলে দুলতে থাকে পুনির সাদা থান-জড়ানো কাঠের মত শক্ত হয়ে যাওয়া বীভৎস দেহটা।

॥ দশ ॥

বর্ষা চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাঁ !

বর্ষা শিউরোয়। আমি শিউরোই না, আমি চেঁচিয়ে উঠি না। আমি ধারণা করছিলাম এমনি কোন একটা পরিণতিই হবে পূর্ণলক্ষ্মীর। এছাড়া আর কি হবে? আর কী হতে পারত হিন্দু ঘরের বিধবা যুবতীর? জীবনের দিকে যে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে, সমাজের গোঁয়ার্তুমির বাইরের আকাশে যে হাত বাড়াতে চেয়েছে !

কিন্তু শুধুই কি একশো বছর আগে? আজও কি এমনি ভয়ঙ্কর পরিণতির হাতে আত্মসমর্পণ করে চলছে না হিন্দু অহিন্দু অনেক মেয়ে? শুধু মেয়ে বলেই সমাজ সংসারের অনেক অনাচারের গ্লানি বহন করে মরতে হচ্ছে না তাদের? পূর্ণলক্ষ্মীদের আমলে হয়তো অনাচারের মাপকাঠিটা ছিল একটু বেশি তীক্ষ্ণ, বেশি সূক্ষ্ম, বেঁচে থাকবার সীমানাটা ছিল আরও সঙ্কীর্ণ, এ যুগে সেই সীমানাটা হয়তো একটু বিস্তৃত হয়েছে, সেই মাপকাঠিটা একটু ভোঁতা হয়ে গেছে।

কিন্তু তাতে কি? মেয়ে হওয়ার অপরাধটা তো মুছে যায় নি।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—পূর্ণলক্ষ্মীর কাহিনী তো শেষ হল, আমি এবার উঠি মা লক্ষ্মী।

আমি ভাবলাম, উঠুন। কিন্তু বর্ষার কৌতূহল তখনও প্রশমিত হয় নি। সে সেই বিচলিত অবস্থাতেই বলে ওঠে—যোগেশ্বর তারপর কি করল বলবেন না?

—যোগেশ্বর? তার পর? ভদ্রলোক একবার গলাটা ঝেড়ে বলেন—সে তো অনেক কথা। বাবু বিরক্ত হচ্ছেন। রাত হচ্ছে। খাওয়ার বিলম্ব হচ্ছে।

—না না, বিরক্ত হবেন কেন? বর্ষা আমার হয়েই রায় দেয়—বেশি তো রাত হয় নি? আমরা কতদিন লাস্ট শো-তে সিনেমা দেখে এসে রাত বারোটায় খাই। আপনি বলুন।

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী যে কেন বলেছে শাস্ত্রে, অনুভব করতে পারি।

ভদ্রলোক একটু কেশে একটু থেমে বলেন—তবে শুনুন। মনের মধ্যে কথার সমুদ্র। কতকাল ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি, শুনতে তো চায় না কেউ।

ভদ্রলোকের এই রহস্যঘন কথাগুলোয় আমার কেমন গায়ে কাঁটা দেয়। অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকি পরবর্তী কাহিনীর অপেক্ষায়।

— কী বলছিলেন ? তার পর যোগেশ্বর কি করল ? অনেকক্ষণ মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকল যোগেশ্বর, বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে গেল তার কাছে। তার মনে হতে থাকল আর সে উঠবে না। ওই ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পড়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে মরে যাবে, পাথর হয়ে যাবে।

বিধাতার নৃশংসতা চিরকাল সয়ে আসছে মানুষ, সয়ে চলতে হবে, সেটা তার অভ্যস্ত। কিন্তু মানুষের নির্লজ্জ নৃশংসতা সহ্য করা বড় কঠিন।

কঠিন, সেটা নতুন করে প্রমাণিত হল যোগেশ্বরের ক্ষেত্রে। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর রাম মুখুজ্যে যখন হেঁট হয়ে পিঠে হাত দিয়ে বলল, কি আর করবে ভাই। ওঠ। যা হবার তা তো হয়ে গেছে—

তখন চিরশান্ত যোগেশ্বর সহসা উন্মাদ হয়ে উঠল। উন্মাদ হয়ে উঠে রাম মুখুজ্যের গলাটা দু হাতে চেপে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল—ঠকিয়েছিস! তুই আমায় ঠকিয়েছিস। পাপিষ্ঠ শয়তান নরকের কীট! ওকে মেরে ফেলে ঝুলিয়ে রেখেছিস, আর আমায়— আয় তোকেও পাঠাই তোর জায়গায়—

রাম মুখুজ্যে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে হাউমাউ করে চেঁচায়—আমার কোন দোষ নেই ভাই, আমায় কেন দুষছ ? আমি কিচ্ছু জানি না। ও আমাকেও ঠকিয়েছে। আমায় বুঝিয়েছে যেন কতই মত আছে তোমার প্রস্তাবে। আর আমার চোখের আড়ালে—। ও ভাই যোগেশ্বর, একের পাপে আরের দণ্ড কেন ?

এই সময় শরৎশশী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বুকে ভর দিয়ে

হামাগুড়ি দিতে দিতে। ভাঙা গলায় কুৎসিত চিৎকারে বলে ওঠে—ওগো কে কোথায় আছ এসে দেখ গো। বাড়ি চড়োয়া হয়ে মানুষটাকে মেরে ফেলতে এসেছে।

চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করলে যে খুব একটা সুরাহা হবে, এমন কথা রাম মুখুজ্যে ভাবে না, তাই পরিবারকেই ধমক লাগাতে যায় সে। আটক পায় না, কারণ শরৎশশীর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বর রামের গলাটা ছেড়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

রাম মুখুজ্যে খিঁচিয়ে আসে—তুই থাম তো মাগী। চেঁচিয়ে পড়শী জড়ো করে আর কেলেঙ্কার বাড়াতে হবে না। দোরে পালকি দেখলে লোকে কি বলবে, তা ভেবেছিস? সরে এসে বলে—ভাই যোগেশ্বর, তুমি আমায় আসামী করছ, কিন্তু ভেবে দেখ আমি দোষী কিসে? আমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, মায়ের পেটের ওই একটা ছোট বোন, আমি ওকে—কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মুছল রাম মুখুজ্যে—আমি ওকে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি? তুমি বলতে পারলে একথা? ও আমাদের দুজনের চোখেই ধুলো দিয়েছে ভাই, চাতুরী খেলেছে। মিথ্যে সম্মতি দিয়ে তলে তলে এই মতলব ভেঁজেছে। বামুনের বিধবার পটপটানি আর কি! খুব দেখাল বটে।

—নীচ, পাষণ্ড, বামুনের ঘরের গরু! তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। তোর যদি একটা পরিবার না থাকতো তো তোকে আমি এইখানে খুন করে মাটিতে পুঁতে রেখে যেতাম! বলে যোগেশ্বর পুনির ঘরের দিকে তাকিয়ে মাত্র না দেখে, হনহন করে পালকিতে গিয়ে উঠল।

রাম মুখুজ্যের মুখ আমসি হয়ে গেল। কি করবে যোগেশ্বর? ওর ওই মুসলমান বস্তির প্রজাদের ডেকে নিয়ে আসবে? রাম মুখুজ্যের শঠতার উপযুক্ত শাস্তি দেবে? এত আকুলতাতেও মন ভিজল না। পষ্ট বলল, বিশ্বাস করি না। কি হবে তবে? রাম মুখুজ্যে ছুটে গিয়ে বলবে, বিশ্বাস কর ভাই, আমি কিছু জানি না। তার সাক্ষী তোমার দানপত্তর দলিল সব আমি ফেরত দিচ্ছি।

হ্যাঁ, সেই ভয়ানক ভয়ের সময় ওইরকম একটা বাসনাও হল রামের। ভাবল, বাঁচলে তবে তো বিষয়! যদি লেঠেল এনে মেরেই ফেলে, কি ঘরে আগুন দিয়ে দেয়? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ধরে ফেলল পালকি। বলল—ভাই, বিশ্বাস করবার জন্যে কি করতে হবে বল? কি করলে তুমি সন্তোষ হবে?

আমার সন্তোষ হবে তোমাকে তুষানলে দগ্ধে দগ্ধে মারলে। তা ছাড়া নয়। আর···জানতে পারলে মানুষের গড়া স্বর্গকে পায়ে দলে পিষে মাড়িয়ে চলে গিয়ে বিধাতার গড়া নরকে সে কতখানি সুখে আছে। হ্যাঁ···হ্যাঁ নরক। আত্মঘাতীর নরক ছাড়া আবার কোথায় ঠাঁই হবে!···এই, পালকি চালা।

রাম মুখুজ্যের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল পালকি।

বর্ষা আবারও প্রশ্ন তোলে—আচ্ছা ওদের দুজনেরই মনের কথা জানতে পেরেছেন আপনি কি করে? বলুন না কার কাছে শুনেছেন এদের কাহিনী? বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।

—প্রশ্ন তুলবেন না মা লক্ষ্মী। প্রশ্ন তুলবেন না। অনেকবার নিষেধ করেছি! আমি বেখাপ্পা জীব, হঠাৎ চটে উঠে কি করে বসি ঠিক কি? ওই জন্যে এ বাড়ির আগের ভাড়াটেকে—হ্যাঁ, কি বলছিলেন? কি করে জানলাম? ধরে নিন না আমি সর্বজ্ঞ।

আগের ভাড়াটে সম্পর্কিত কথাটা আবার বক্ষপঞ্জরে শিহরণ জাগায়, আর বর্ষার ওপর রাগে ফুঁসতে থাকি। বুড়ো তো বার বার চলে যেতে চাইছে, কেন ওকে আটকানো! কে জানে বুড়োটা মানুষ না প্রেত! ওর ওই অস্বাভাবিক ধরন-ধারণ, কেমন কেমন কথা বার-বার যেন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। অজানা অচেনা একটা লোক এইভাবে শোবার ঘরের মধ্যে এসে শেকড় গেড়ে বসল। আমরা মোহগ্রস্তের মত তাকে ঘিরে বসে আছি····কী এ? ও কি কোন জাদুকর? বশীকরণ মন্ত্র জানে? সম্মোহিত করে ফেলেছে আমাদের?

বুড়ো বলে—হ্যাঁ কি বলছিলাম—পালকি তো চলে গেল। রাম মুখুজ্যে সেই ঝুলন্ত মড়াকে দোর দিয়ে রেখে সদরে খিল লাগিয়ে

নিজের ঘরে গিয়ে সারারাত পৈতে হাতে বসে দুর্গানাম জপ করতে লাগল।

কিন্তু তার আশঙ্কা সত্য হল না। যোগেশ্বর সে রাত্রে লেঠেল নিয়ে তেড়ে এল না। সে রাত্রে নয়, কোন রাত্রেই নয়। যোগেশ্বরকে আর কোনদিন দেখা গেল না এ অঞ্চলে। চিরদিনের জন্যে মুছে গেল যোগেশ্বর।

অনেকদিন ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ সহজ হল রাম মুখুজ্যে। জমিজমার খবরদারি করে বেড়াতে লাগল। নিজের অবস্থা ফেরাতে শুরু করল। কিন্তু কদিনই বা।

যোগেশ্বরের ভাড়াটে প্রজারা প্রথম প্রথম আশা করছিল বাবু তীর্থ থেকে ফিরে আসবে। কিন্তু ক্রমশ যখন দেখল তীর্থ থেকে আর ফিরল না যোগেশ্বর, তখন ওই 'সরকারবাবু'টাকে গ্রাহ্যমাত্র না করে বেপরোয়া বিনা খাজনায় বাস করতে লাগল। ভাড়া, খাজনা কোন কিছুই আর আদায় করে উঠতে পারল না, মুখে তড়পাই ভিতরে ভীরু লোকটা।

ওদিকে যে জাহাজী ব্যবসার দু'আনার অংশীদার ছিল রাম মুখুজ্যে—সে অংশও তার নির্বুদ্ধিতায় হাতছাড়া হয়ে গেল। চৌদ্দ আনার মালিক সামন্তবাবুর কোন পাত্তা না হওয়ায় সবটা বারো-ভূতে লুটে খেল।

এর উপর ওদিকে সংসারেও অনেক ঝামেলা ঢুকেছে। আস্তে আস্তে শরৎশশীর এক বোন থেকে দুই বোন, তার পর বোনপো বোনঝিদের আবির্ভাবে বাড়ি বোঝাই হয়ে উঠেছে, সর্বদা সরগরম। রাম মুখুজ্যের আর কোনখানে ঠাঁই হয় না। সরতে সরতে ক্রমশ আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে পুনির পরিত্যক্ত সেই ছোট্ট ঘরটায়। যে ঘরে রাত হলেই আড়া থেকে একটা সাদা থানে মোড়া কাঠের মত মানুষ ঝুলতে দেখে রাম মুখুজ্যে।

আমার ও ঘরে ভয় করে—শুনে বড় শালী দয়াপরবশ হয়ে কোথা থেকে একটা রামনামের কবচ এনে পরিয়ে দিয়েছিল, আর ভগ্নীপতির

মাথার বালিশের নীচে একটা লোহার 'অন্তর' গুঁজে রেখে গিয়েছিল।

চারিদিক থেকে উৎখাত হয়ে বিষণ্ণ রাম মুখুজ্যে একদিন এইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই এইখানে এই বাড়ির জমিতে, এমন সময় দেখল টমটম হাঁকিয়ে এক বাবু এসে পুকুরপাড়ের রাস্তায় থামলেন। টকটক করছে গায়ের রং, ধবধব করছে পিরান, মাটিতে কোঁচা লুটানো ধুতি, পায়ে চীনেবাড়ির জুতো, হাতে রুপো-বাঁধানো বেতের ছড়ি। সরু গোঁফ, চওড়া বুকের ছাতি। ঘুরে বেড়ানো রাম মুখুজ্যেকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। বললেন—এ জমি কার বলতে পারো ?

রাম মুখুজ্যে ওই মহিমার দিকে তাকিয়ে বিনয়ে গলে গিয়ে বলল—আজ্ঞে এই অধমের।

বাবু হাতের বেতটা একবার শূন্যে আস্ফালন করে বললেন—পরিহাস করছ না সত্যি কথা বলছ ?

—আজ্ঞে বাবু আপনার সঙ্গে পরিহাস ?

—বেশ! না করলেই ভাল। কতটা জমি তোমার ?

—আজ্ঞে তা সঠিক বলতে পারব না, খতে লেখা আছে। এ হদ্দ থেকে ওই ও হদ্দ পর্যন্ত সবই এই অভাগার।

—হুঁ। তোমার বিনয়টা মন্দ না। তা এত জমি করবে কি ? বেচে ফেল না ?

ক্ষণপূর্বে ঠিক ওই কথাই ভাবছিল রাম মুখুজ্যে। এই সব বিষয়-বিষে দরকার নেই তার। কেউ যদি মালিক বলে না মানে তো সে বিষয়ে লাভ কি ? তাই এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে হাতে চাঁদ পেল, ভাবল লোকটা ভগবান প্রেরিত। হাত কচলে বলল—আজ্ঞে কেনবার লোক পেলেই বেচি।

—বটে! বাবুর মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠল। বললেন—ধরে নাও লোক পেয়ে গেছ। এখন দামটা কত, জিনিসটা কতখানি হিসেব হোক।

রাম মুখুজ্যে গলে গিয়ে বলল—আজ্ঞে হোক।

দরদাম হতে দেরী হল না।

কারণ রাম ভাবল, যা পাই—তাই মঙ্গল, পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তবু তো নগদ টাকা।

বাবু বললেন—তোমাকে কিন্তু নায়েব হতে হবে।

রাম মুখুজ্যে ভাবল, তা হলে তো হাতে স্বর্গ পাই। ওই হারামজাদা প্রজাগুলোকে শায়েস্তা করি। আমায় জমিদার বলে মানতে চাইছিল না পাজীরা, প্রাণ পড়ে আছে সেই যোগেশ্বরের ওপর। নতুন জমিদারের কাছে ট্যাঁ ফোঁ চলবে না। তা ছাড়া ভাবল, হ্যাঁ জমিদার বলতে যদি মানতে হয় তো, এই রকম মানুষই দরকার। এ যেন মাথার চুলটি থেকে পায়ের নখটি পর্যন্ত জমিদার হবার জন্যেই—তৈরি। নিয্যস বংশানুক্রমে জমিদার। ভাবল এসব।

কিন্তু মুখে মান মর্যাদা বজায় রাখার ভানে বলল—আজ্ঞে সেটা কি করে সম্ভব? যেখানে মালিক ছিলাম, সেখানে চাকর হয়ে—

বাবু হঠাৎ হাতের রুপো-বাঁধানো ছড়িটা তুলে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন। ভারী যেন মজার কথা শুনেছেন।

তার পর বললেন—দেখ হে বাপু, জহুরী জহর চেনে। তোমায় চিনতে আমার ভুল হচ্ছে না। মালিক তুমি কোনো কালে ছিলে না, তোমার ওই হাড়গোড় বার-করা কাঁকলাশের আকৃতিই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। তোমার তিন পুরুষে কখনও ঘি দুধ খায় নি—

রাম মুখুজ্যে এবার সত্যি আহত হল।

বলল—বাবুর বোধহয় পরিহাস প্রকৃতিটা প্রবল। নচেৎ—

বাবুর আবার সেই উদ্দাম হাসি।

—রাগ হচ্ছে না কি হে? আহা হা, বোঝার ভুল ও তো হয় মানুষের? তা একটু বৈঠকখানায় বসতে-টসতে পাওয়া যাবে? একটু আমোদ-আহ্লাদের যোগাড়-যন্তর আছে তো? সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, শরীরের মধ্যে টানছে।

রাম হকচকিয়ে বলল—আজ্ঞে কী বলছেন?

আজ্ঞে, হুজুর, বাবু!' এইসব সম্বোধনগুলো যে তার মান-সম্মানের উপযুক্ত হচ্ছে না, এ আর মনে পড়ে না রামের।

বাবু রহস্যে চোখ কুঁচকে বলেন—বলছি বিলিতি-টিলিতি আছে ঘরে? আজ আমার চাকর ব্যাটা গাড়িতে বোতল তুলে দিতে ভুলে গেছে।

কথা শেষ না হতেই রাম মুখুজ্যে জিভ কেটে ছু হাত পিছিয়ে যায়। আর স্বভাবতঃই হাতটা গিয়ে পৈতেয় ঠেকে।

—আজ্ঞে বলছেন কি? বামুনের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করে জল গ্রহণ করি না—

বাবু আর একবার ছড়িটা রামের নাকের সামনে ছুলিয়ে বলেন—আহা সেই কথাই তো বলছিলাম, বামুনের ছেলে, সাত পুরুষে চালকলা। তা বিষয়সম্পত্তি জুটল কোথা থেকে? কোনও বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে-টাতিয়ে মালিক হয়ে বসো নি তো?

'বিধবার সম্পত্তি' কথাটা শুনেই বুক সাত হাত বসে গেল রাম মুখুজ্যের। প্রমাদ গণে ভাবল, আর কিছু নয়, সব জেনেশুনে এসেছে।

কিন্তু জানবেটা কী?

পুনির মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য তো কাকে-পক্ষীতেও জানে না। এক সেই ক্ষ্যাপাটা, যে 'আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না' বলে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেছল।

তা তার সঙ্গে এঁর যোগাযোগ কিসের? আর থাকলেও তার কথা ইনি বিশ্বাস করবেন কেন? বুকে বল বাঁধল রাম মুখুজ্যে। বলল—বুঝতেই পারছি বাবু একটু রসিক লোক। কাজেই কি আর করা।

—আচ্ছা থাক থাক—

বাবু অভয়-হস্ত উত্তোলন করেন—মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না, মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ আমি বরদাস্ত করতে পারি নে। থাক, ওসব কথা থাক। তা হলে ওই নায়েবীর কথাটা পাকা রইল?

—আজ্ঞে বাবু যখন বলছেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো চাই। তবে এই সামনের হপ্তাতেই রেজেস্টারী করে ফেলার ব্যবস্থা করছি। তুমি দলিল-টলিলগুলো নিয়ে—

টমটম হাঁকিয়ে এদিক-ওদিক চক্কর দিলেন বাবু, তারপর হঠাৎ রাম মুখুজ্যের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—এ বাড়িটা কার?

—আজ্ঞে এই আমারই কুঁড়ে।

রাম এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল, বাড়ির মধ্যে থেকে হঠাৎ তার শালীর ছেলেটা না বেরিয়ে আসে। হতভাগা যেমনি অসভ্য তেমনি নেশাখোর। ওকে দেখলেই তো রাম মুখুজ্যের বামুনের গুণ-গরিমা বেরিয়ে যাবে।

তা, ভাগ্যক্রমে এ সময়টা কেউ বাইরের দিকে ছিল না।

কিন্তু তাতে কি?

বাবুর হাসির কমতি হল না তাতে।

রাম মুখুজ্যের কুঁড়ে দেখে দমকে দমকে হাসতে লাগলেন তিনি। তার পর বললেন—তা—বেশ বেশ! খানদানী মানুষ, তাই এমন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা! কিন্তু অট্টালিকাখানিতে তো এবারে একটা চুনবালি লাগাতে হবে। দে চৌধুরীদের নায়েবের একটু ঠাটবাট থাকা দরকার।

দে চৌধুরীর টম্‌টমের ধুলো মিলিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর অবধি রাম মুখুজ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, না না, ওসব নায়েব-ফায়েব হওয়ার দরকার নেই, নগদ টাকার পুঁটুলিটি গুণে-গেঁথে চাটি-বাটি তুলে অন্য কোথাও চলে যাব। লোকটা বড় অহঙ্কারী, মানুষের মান রেখে কথা বলতে জানে না।

কিন্তু রাম মুখুজ্যের এই শ্মশানবৈরাগ্য কি টিঁকেছিল? এই সাধু সংকল্প?

না, টেঁকে নি।

টেঁকার উপায়ও থাকে নি।

কারণ জলের দরে সব বিকিয়ে দিয়েও যে বড়সড় টাকার তোড়াটি পেয়েছিল রাম মুখুজ্যে, সে তোড়া—

কিন্তু সে দুঃখের কথা থাক।

রাম মুখুজ্যের যে চাটি-বাটি তুলে চলে যাওয়া হয় নি, এটাই হল মূল কথা।

রাম মুখুজ্যের সংসার একই ভাবে চলে।

শরৎশশী রাতদিন মরে মরে, অথচ মরে না, শরৎশশীর মায়ের পেটের বোন রুগ্ণ বোনকে উঠতে-বসতে 'কথা' শোনায়, ভগ্নীপতিকে মুখনাড়া দেয়, আর রাম মুখুজ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

তার পর তো একদিন—

হ্যাঁ কি যেন একটা পূজোর দিন ছিল সেদিন। শালী বলেছিল ব্রত উপোস করেছে, দেবস্থানে পূজো দিতে যাবে। ভগ্নীপতির অনুমতি নিয়ে কাজ করছে, এমন কিছু ভাববার নেই, ওবেলা যে রান্না হবে না, মুড়ি-চিঁড়ে খেয়ে থাকতে হবে, সেই কথাটাই জানিয়ে গেল।

অবহিত করিয়ে রেখে গেল এবেলা থেকে।

কিন্তু সেই শালী কি আর ফিরে এল ভগ্নীপতির বাড়ি? আসে নি। এসেছে কিনা খোঁজ করতে শরৎশশীর ঘরে ঢুকেই ছিটকে পালিয়ে এসেছিল রাম মুখুজ্যে, ফুটন্ত তেলের কড়ায় পড়া জ্যান্ত কৈ মাছের মত।

॥ এগারো ॥

যাক ওটা পরের কথা। এখানে তখন শুরু হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়।

বোন বিক্রি করে যে সম্পত্তির মালিক হয়েছিল রাম মুখুজ্যে, সে সব জলের দরে বেচে দিল গৌরীশঙ্কর দে চৌধুরীকে। তিনি এসে এই বাড়ির পত্তন করলেন। পরে অবিশ্যি আশেপাশে ছোটবড় আরও অনেক বাড়ি করেছিল দে চৌধুরীরা, কিন্তু বসত বাড়ি হিসেবে এইটাই তৈরি হল। যোগেশ্বরের বোনা ধান রাম মুখুজ্যের হাত-ফেরতা হয়ে গিয়ে উঠল দে চৌধুরীদের গোলায়। যে প্রাসাদের স্বপ্ন যোগেশ্বরের মনের অতলে ছায়া ফেলত, সেই প্রাসাদ গড়া হতে লাগল। ভাগ্যবান গৌরীশঙ্করের সুবিধে করতেই বোধহয় সম্পত্তি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই—কোথা থেকে এক ঠিকেদার এসে হাজির হল, যার পরামর্শে বাড়ির নক্সা করলেন গৌরীশঙ্কর।

কি ভাবে যে সেই সামান্য ঠিকেদারটা গৌরীশঙ্করকে বশ করে ফেলল, সে এক রহস্য। কিন্তু দেখা গেল গৌরীশঙ্কর তার কথায় উঠছেন বসছেন। আর দেখা গেল তার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে কী এক গোপন পরামর্শ গৌরীশঙ্করের! লোকটা যে কোন্ জাতের ধরা পড়ত না। তার কালো কুচকুচে চাপদাড়ি দেখে মনে হত মুসলমান, কিন্তু কথা শুনে সে ভুল ভাঙত। প্রত্যেক কথায় লোকটা বলত, শালার ভগবানের নিকুচি করেছে। ওর ওই 'ভগবান' কথাটাই ওকে চাপদাড়ির পরিচয় থেকে সরিয়ে আনত।

রাতের অন্ধকারে পরামর্শ হত এই বাড়ির দেয়ালের মধ্যেকার ফাঁপা-ঘরের, কুলুঙ্গির পিছনের চোরা ঘর আর চোরা সিঁড়ির, নীচের তলার এখানে-সেখানে পাতালঘরের। বেশী মজুরি দিয়ে অন্য জায়গা থেকে মিস্ত্রী এল, তারা দিনের পর দিন দে চৌধুরীর পয়সায় খেল, কাজ করল ঠিকেদার বাবুর নির্দেশে প্রাণপণে। আর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল যেন।

দ্রুতগতিতে গড়ে উঠল বাড়ি। চৌকো উঠোন ঘিরে চকমিলানো ঘরের সারি, বাইরের দিকে চারদিকেই জালিকাটা জাফরি, থাম, খিলেন, চওড়া কার্নিশ। উঁচু উঁচু বড় বড় জানলা দরজা, শার্সি খড়খড়ি, নক্সা-কাটা মেঝে। আপনিও দেখছেন তো তার কিছু কিছু। পয়সা খরচ করে কিনেছেন, সারিয়েছেন। অবিশ্যি পশ্চিম অংশটার আর চিহ্ন দেখলেন না, সেবারের বড় ভূমিকম্পে পড়ে খতম হয়ে গেল। যে দিকে থাকতো গৌরীশঙ্করের দূর-সম্পর্কের এক পিসি আর পিসতুতো ভাই বোন।

গৌরীশঙ্কররা এক রাজা খেতাবধারী বনেদী জমিদারের দৌহিত্র বংশ। মামা সেখানে রাজ্যপাট করেন, দাদামশাইয়ের কাছে উপহার পাওয়া সম্পত্তি নিয়ে গৌরীশঙ্কর মামার ঘেঁষাঘেঁষি থাকতে রাজী না হয়ে সে সব মাতুলকে বেচে দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে অন্যত্র বাস করতে এসেছেন।

সূর্যের উপগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, আপন মণ্ডল রচনা করতে চান।

গৌরীশঙ্কর আর ভবানীশঙ্কর দুই ভাই, মালতী আর চারুহাসিনী দুই বৌ। দুই বৌয়ের মিলিয়ে গুটি চারেক ছেলেমেয়ে, আর গৌরীশঙ্করের বুড়ো এক কাকা। এই হচ্ছে চৌধুরীদের নিজস্ব সংসার। কিন্তু আত্মীয় অনাত্মীয় আশ্রিত পরিজনের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন, ওই দূর-সম্পর্কের পিসি প্রভাবতী।

প্রকৃতির রাজ্যে যেমন রাত আর দিন, কৃষ্ণ আর শুক্ল, জোয়ার আর ভাঁটা ইত্যাদি করে দুই বিপরীতের খেলা, এই দে চৌধুরীদের সংসারটাতেও ঠিক তেমনি। পবিত্রতা আর অপবিত্রতা দুইয়ের খেলা। ওদের দিনে এক জগৎ, রাতে আর এক জগৎ। দিনে ভোরবেলা গৃহদেবতার ঘরে মঙ্গলারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, ধূপ-ধুনোর গন্ধে বাতাস পবিত্র হয়ে ওঠে. পুরুষেরা গরদের ধুতি চাদর পরে খড়ম খটখটিয়ে ঠাকুরদালানের সামনে এসে জোড়হাতে দাঁড়ায়, মেয়েরা স্নানান্তে এলোচুলের আগায় গিঁট দিয়ে লালপাড় গরদের শাড়ি পরে

পূজোর গোছ করে দেয়, ছোটরা মুখ ধুয়ে কাচা জামা কাপড় পরে আরতি-অন্তের পঞ্চপ্রদীপের তাপ নেয়, 'বাণেশ্বর'কে প্রণাম করে, আর গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় দেয়। প্রসাদ মুখে না দিয়ে কারো জল মুখে দেবার হুকুম নেই, ঠাকুরকে ভোগ না দিয়ে কোন নতুন ফল নিজেদের ভোগে লাগাবার উপায় নেই।

মধ্যাহ্নে স্নানান্তে গৌরীশঙ্কর আন্থাস্তোত্র মহিম্নস্তব পাঠ করেন, ভবানীশঙ্কর শিবস্তোত্র। মেয়েরা সন্ধ্যারতির যোগাড় করে রাখে, 'শীতলে'র ফল কেটে, মুগের ডাল ভিজিয়ে গোলাপজলে ভেজা ন্যাকড়া চাপা দিয়ে রাখে, গুরু পুরোহিতের 'সেবা' হলে তবে আহারে বসে।

কিন্তু বিকেল গড়ালেই বাড়ির চেহারা বদলে যায়। তখন বিলাসিতার স্থূল আয়োজনে বাড়ির চেহারা সকালের সেই পবিত্রতা হারায়।

খাস ঝিয়েরা আসে বৌদের অঙ্গসেবা করতে, নিত্যি নতুন ঢঙে খোঁপা বেঁধে দিতে। বিলিতি সাবান আর ফরাসী এসেন্সের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে ঘরে ঝাড়ের বাতি জ্বলে, উঁচু পালঙ্কে সাটিনের বালিশ, নেটের মশারি দিয়ে বিছানা পাতা হয়ে যায়, বৌরা ঢাকাই জামদানী সিমলে শান্তিপুরি হাওয়া-শাড়ি বেগমবাহার পরে কৌচে হেলান দিয়ে বসে। তাদের গলার চওড়া চওড়া হার আর হাতে বাহুতে পরা বালা-অনন্ত তাগা-তাবিজের ওপর আলোর ঝিলিক পড়ে বিদ্যুৎ ঠিকরোয়। দাসীরা কোলের কাছে তাকিয়া আর হাতের কাছে রুপোর ডিবেভর্তি পান এগিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে খোসগল্প করে বৌরাণীদের সঙ্গে।

আশ্রিতা খোশামুদের দলের এইটাই মরসুম। বৌয়ের নিন্দে আর এক বৌয়ের কাছে করে, অথবা আশ্রিতা মহলের নানান রসের গল্প করে, কিছু বাগিয়ে নিতে পারবার এটাই সময়।

না, সারারাত তাদের বৌরাণীদের পাহারা দিতে হয় না। গৌরীশঙ্কর ভবানীশঙ্কর দুই ভাই-ই নিয়মী, তাঁরা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর

আর বৈঠকখানার মজলিসে থাকেন না। অন্দরে উঠে আসেন। অবশ্য অধিকাংশ দিনই 'উঠিয়ে' আনতে হয়, কারণ অবস্থাটা খুব এক্তিয়ারে থাকে না। তবু একেবারে গড়িয়ে পড়েও থাকেন না। মাতুল বংশের আওতা ছেড়ে এলেও কায়দাটা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চান। মামারাও নিয়মী। তাঁরা পঞ্জিকা দেখে অন্তঃপুরে গমন করেন।

সে যাক, সন্ধ্যা থেকে ওই যে রাতদুপুর? ওই সময়টা নিয়েই বৌরাণীদের যত নিঃশ্বাস, যত কৌতূহল। কী করেন কর্তারা এতক্ষণ মোসাহেব পরিবেষ্টিত হয়ে?

নীচের তলায় বেটাছেলেরা বাবুদের আর উপর তলায় মেয়েমানুষেরা বৌরাণীদের মনোরঞ্জনের উপায় আবিষ্কার করে আসর জমিয়ে রাখে। মালতী বড়বৌ—তবু রূপে যৌবনে সেই যেন ছুটকি। চারুহাসিনী একটু ভারী মানুষ। রঙটা গোলাপ ফুলের মত হলেও গালের মাংসর চাপে নাকটা ডোবা, আর চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে। হাতের বালা অনন্ত বছরে দুবার ছোট হয়ে যায়, স্যাকরার পোয়া বারো।

চারুহাসিনী বলে—আর পারি না বাবা, দিন দিন যেন তুলোর বস্তা হচ্ছি।

নন্দর বৌ কাছে বসে আঁচল খুলে দোক্তার টিপ মুখে ফেলে বলে—বকো না ছোট বৌরাণী। একে কি আর মোটা বলে? এ হল 'সারে মাতে'। বড় ঘরের বৌয়ের গায়ে এটুকু শাঁস না থাকলে সাজে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা খাটো করে বলে—ওই যে আমাদের বড় বৌরাণী। যেন বাতাসে ফড়িং। ভরন্ত বয়সে অমনটা কি আর মানায়? অথচ ওই ফিরিঙ্গী কাটের মুখ আর চাঁচাছোলা গড়ন বলে দেমাক কত।

চারুহাসিনী বলে—সে কি গো। তবে যে শুনি আমাদের বড়-বিবির শরীরে দেমাক নেই।

—নেই। কে বলে? বড় বৌরাণীর পেটোয়ারা তো? কী

খোশামুদের ঝাড় ছোট বৌরাণী, কী খোশামুদের ঝাড় সব। দুধ-কলা দিয়ে কি নিধি যে পুষছো তোমরা? নইলে আর—চোখ টেনে, গলার স্বর টেনে নন্দর বৌ বলে—থাক বাবা, ওসব কথায় কাজ নেই। কে কোথা থেকে শুনবে।

—বলি শুনবে তার কি? কে তোমার মাথাটা হাতে কাটবে? তুমি তো হক কথা বৈ বানিয়ে বলবে না?

—বানিয়ে! বানিয়ে কথা যদি বলি ছোট বৌরাণী, মুখে আমার পোকা পড়ুক। বলছি—এই যে বড় বৌরাণী, যতই হোক বুড়ো মাগী, তার কি দরকার ওই কচি দ্যাওরটার সঙ্গে অত রঙ্গরস করবার? ছোঁড়াটার লেখাপড়ায় মন আছে, পিসিমাও বৌরাণীর ঢলানিপনা দেখলে মুখ বিষ করে, কিন্তু সে-সব কিছু মানে? যখন-তখন ডাক দিয়ে ঘরে আনাচ্ছে। ওই যে টগর—বড় বৌরাণীর মুখের পানটি, ওইটি হচ্ছে যত কুমন্ত্রণার গুরু। ওকে দিয়েই যত বেনো জল ঘরে ঢোকানোর কলকৌশল।

—দ্যাওর রয়েছে বুঝি ঘরে?

—রয়েছে তো!

—কতক্ষণ?

—সেই কোন্‌কাল থেকে। বড় বৌরাণী সায়েব-বাড়ি থেকে খানা আনিয়েছেন দ্যাওরকে খাওয়াবার জন্যে, কাছে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।

—তা সায়েবী হোটেলের খানা কি আমরাই আনাতে পারি না গো? ডেকে আনাও না একদিন—চারুহাসিনী একটু কটু হাসি হাসে—দেখি শুধু তাতেই বশ কিনা।

নন্দর বৌয়ের সঙ্গে একটি রহস্য হাসির বিনিময় হয়ে যায় চারুহাসিনীর।

—পিসিমার মুখ তো কালো অন্ধকার।

—তা ছেলেকে বারণ করেন না কেন?

—করেন না ভয়ে। বড়গিন্নীর বিরাগভাজন হবার ভয়ে। ছেলের

যাবতীয় পড়ার খরচ তো সবই বড়গিন্নী যোগাচ্ছে। যে মাস্টার পড়াতে আসে তাকে নাকি মাস মাস তিরিশ টাকা করে মাইনে দিতে হয়।

—বল কি গো! মাস্টারের মাইনে তিরিশ টাকা! চারুহাসিনী চোখ কপালে তোলে।

—তাই তো শুনি।

—বেশি মাইনে দিয়ে হাত করার ছল। চারুহাসিনী মুখ টিপে হাসে।

হাসে নন্দর বৌও। বলে—সে গুড়ে বালি গো। একেবারে বুড়ো হাবড়া।

—বুড়ো হাবড়া! চারুহাসিনী মাংসর খাঁজে কুঁচকে যাওয়া চোখকে আরও কুঁচকে বলে—কত বুড়োই দেখলাম। ক'নে বেলায় এসে দাদাশ্বশুরকেও দেখেছি, পরে মামাশ্বশুরদেরও দেখেছি, আবার এই খুড়শ্বশুরকেও দেখছি। বুড়ো বলে কম তো কেউ যায় না।

—বলো না ছোট বৌরাণী, বলো না। তোমার ওই খুড়শ্বশুরের পিরবিত্তি দেখলে হাড় জ্বলে যায় বাবা। দাসী-বাঁদীগুলোর তো একা ওনার ঘরে ঢোকবার সাহস নেই। অথচ হরঘড়ি তামাক চাই। চাকরদের হাতে সাজা পান তামাক ভাল লাগে না বুড়োর।

—তবে? বুড়ো বলে নিশ্চিন্দিটা কোথায়? মাস্টারটাকে একদিন দেখাতে পারো আমায়?

॥ বারো ॥

মালতীর ঘরে আশ্রিতাদের গতিবিধি কম। তাদের চেয়ে ঝিয়েদের আদর বেশি। তুই-তোকারি না করলে সুখ হয় না মালতীর, সুখ হয় না যখন-তখন 'দূর হ' 'বেরো' না করতে পারলে। ওই ওর আদর। আশ্রিতারা তো বেশির ভাগই কোথাও না কোথাও একটু সম্পর্কের

দাবী রাখেন। হয়তো বা শাশুড়ী পর্যায়েরই কেউ এলেন খোশামোদ করতে। রেখে-ঢেকে ব্যবহার করতে হয় তাঁদের সঙ্গে।

ছোটবাবুর মোসাহেব নন্দ তবু ছোটবাবুর দাদা সম্পর্ক, তাই চারু-হাসিনীর সুবিধে। তবু বয়সে আর মান্যে বড় বলে তুইটা বলে না।

মালতীর ঘরে দাসীরা এসে পা ছড়িয়ে বসে, বাটা বিছিয়ে পান সাজে। মালতী মাঝে মাঝে বলে—তবকদার মিঠের খিলি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেল। দেখি তো তোদের কাঁচা দোক্তা দেওয়া বাংলা পান দু খিলি।

মুখে দিয়ে কিন্তু থু থু করে, পিকদানী এগিয়ে দিতে হয় ছিবড়ে ফেলতে। মুখ বাঁকিয়ে বলে—রাম কহো। এ আবার মানুষে খায়!

—আমরা কি আর মানুষ বৌরাণী!

এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে। মালতী বলে—বৈঠকখানায় কী দেখে এলি টগর?

—আর কি? সেই ঠিকেদার মুখপোড়ার সঙ্গে ফুস-ফুস গুজ-গুজ।

—বাঈজীরা?

—পোড়া কপাল, বাঈজী আবার কোথা গো বড় বৌরাণী। সে তো অনেকদিন বন্ধ। ঠিকেদার মুখপোড়ার পরামর্শে পড়ে সভ্যতা-ভব্যতা সব গেল। নাচনা গাওনা ঘুচে গেছে, এখন শুধু—

দাসী সহসা চুপ করে গিয়ে দোক্তার কৌটা খোলে। কৌতূহল উত্তেজিত করবার কৌশল এটা। জানে মালতী এখন সেই 'শুধু' কী তাই শোনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। করেও তাই। বলে—মরণ, কথা বলতে বলতে থামলি যে?

—থামলাম পরকালের ভয়ে। কানে শুনেছি তাতেই একগুণ পাপ ঘটেছে শরীরে, আবার জিভে উচ্চারণ করলে দশগুণ পাপ অর্শাবে।

মালতী চুটকি পরা পায়ের বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে দাসীর গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে বলে—পুণ্যির ছালা বেঁধে সগ্‌গে যাবি, এমন আশা আছে বুঝি? ঢং রাখ্‌। বল্, ওই লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে কিসের এত পরামর্শ?

—যাকগে বৌরানী পরকালের ভয়। তোমরাই এহকাল পরকাল। বলি তাহলে—জানলার নীচে আড়ি পেতে শুনেছি একদিন। শুনে বৌরানী গায়ে যেন একশো বিছে কামড়াল। সকল অঙ্গে কাঁটা দিল। ঠিকেদার মুখপোড়া বলে কি জানো? বলে এককুড়ি বামুনের বিধবাকে নষ্ট করলে একশো আট বছর পেরমাই হবে। আর নাকি চিরযৈবন হবে। এ নাকি তান্তিরিকের সাধনা। তারিরই এক পেরকার তুক। বড়বাবু তাই—

মালতী গালে হাত দিয়ে বলে—বলিস কি টগর!

—তবে আর বলছি কি! ঐ মুখপোড়াই বড়বাবুকে গুণ-তুক করেছে।

—হ্যাঁ লা, তা তুক্ করলেই হল? এক কুড়ি বামুনের বিধবা পাবে কোথায়?

—ওই মুখপোড়াই তো নাটের গুরু, দেবে সন্ধান। আর আছে ওই মুখুজ্যে। মড়িপোড়া বামনা! যার বাবুর মোসাহেবী করাই কাজ। ওই নাকি দাদন নিচ্ছে।

—দাদন! দাদন কি লো? পাট না তিসি? মানুষের আবার দাদন কি?

—ওই যে, যোগাড় করে দেবে বলে আগাম টাকা নিয়ে তার নিয্যস লেখাপড়া করে দেওয়া। অনামুখো নিজে বামনা তো। বামুনের মেয়ের ঘাঁটি ওর হাতে। শুনতে পাই নাকি ওই হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া মুখুজ্যেটাই আগে এইসব জমির মালিক ছেল। বিশ্বেস হয় না বৌরানী, বিশ্বেস হয় না। নোটো বলে সত্যি। নগদ করকরে টাকার লোভে সব জমি জলের দরে বেচে দিয়েছে। তা লোভে পাপ, পাপে মিত্যু; সেই জমি বেচা টাকা নাকি সব ওর শ্যালীর ছেলে না শালার ছেলে চুরি করে পালিয়ে গেছে। ঘরে ওর একটা রুগ্নী পরিবার ছেল, যাবার আগে সেটাকে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে বুকে জাঁতা চাপিয়ে মেরে রেখে গেছে, চেঁচিয়ে পাছে জানাজানি করে তাই বোধহয়।

—ও মা, কী সর্বনাশ! মাগী তার মাসি না পিসি কী একটা হল যে!

—পয়সার কাছে আবার মাসি পিসি! হুঁঃ! জগতের কিছুই তো জানলে না বৌরানী। সগ্‌গের দেবীর মতন জগতের খল কাপট্যের ওপরে রয়ে গেলে! ঐ মুখুজ্যে লক্ষ্মীছাড়া পয়সার জন্যে নিজের জাত-জ্ঞেত থেকে বিধবা মাসি পিসি ভাইঝি ভাগনী ধরে আনছে না? কী হাল হচ্ছে তাদের? বুকে জাঁতা দিয়ে মারার থেকে কিছু কম?

—হ্যাঁলা টগর, শুনে যে আমার বুক কেমন করছে। শুরু হয়ে গেছে নাকি?

—তা হয়েছে বৈকি বৌরাণী। ওই যে চোরাঘর চোরাসিঁড়ি পাতালপুরী ওই সবই তো হচ্ছে কুকাজের আড্ডা। ঠিকেদার মুখপোড়া আমাদের বড় রাজাবাবুকে উচ্ছন্ন দিতেই ওই সব বানিয়েছে। নোটো বলে মিনসে নাকি ভূত্যাশ্রিত। কে জানে বাবা! সায়েবের আইনে গেরস্ত ঘরের মেয়েমানুষ এনে নষ্ট করা মহাদোষের তো। তাই রাত-বিরেতে পালকি করে মুখ বেঁধে এনে চোরকুঠুরিতে ভরে রাখছে। বড়বাবু ইদিককার ঢালাও আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে ওই চোরাই আমোদে মেতেছেন। তার সাক্ষী সঙ্গী সব ওই ঠিকেদার মুখপোড়া আর মুখুজ্যে।

—হ্যাঁরে টগর, এতে পরমায়ু বাড়ে না কমে লো? মালতী শঙ্কিত প্রশ্ন করে—ওই সব ভাল ঘরের সতী মেয়েছেলের শাপমণ্যি আছে তো?

—তা আবার নেই? টগর পরম কৌতুকে মুখ উজ্জ্বল করে বলে—তোমার কুলুঙ্গীর পেছনের ফাঁপা ঘর দিয়ে উত্তরের সিঁড়ি ধরে নেমে গিয়ে দেয়ালে কান পেতে শুনো না একদিন। ছুঁড়িদের কী কান্না, কী কাকুতি মিনতি।

মালতী অধীর হয়ে বলে—গেলে বাবু টের পাবেন না তো?

—না না, দেয়ালের ইদিক থেকে তো! আমি তো কান পেতে

বসে থাকি।

—হ্যাঁলা টগর, রোজ? রোজ নতুন নতুন?

টগর মুখ কুঁচকে বলে—না গো বৌরাণী, শুনি নাকি আমাবস্যের আমাবস্যেয় নতুন চাই। তান্‌ত্রিকের কাণ্ড তো! বাকী দিন তাদের ধরে ছেঁড়ো কোটো ছ্যাঁচো! নয় তো বিদেয় করে দাও। উঃ বাবা, শতজন্মের পুণ্যি তাই বামুনের বিধবা হয়ে জন্মাই নি।

মালতী হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে—এক গেলাস জল দে দিকি টগর।

জল নিয়ে খায় যতটা তার বেশিটা মাথায় থাবড়ায়। টগর ঝালর দেওয়া হাতপাখা নিয়ে হুস হুস করে বাতাস করে। আহা উহু করে।

একটু সামলে নিয়ে মালতী বলে—পানের বিষম খেয়েছিলাম। হ্যাঁরে টগর, ওই ঠিকেদার মুখপোড়া কী জাত?

—কি জানি বৌরাণী! আগে তো ভাবতাম মোছলমান। মাথা ন্যাড়া, মুখে গোঁফ দাড়ি। তা ক্রেমশ দেখছি মোছলমান নয়।

—কি দেখে বুঝলি?

—রকমসকম দেখেই বোঝা যায়।

—নাম কি?

—নাম জানি না। সবাই তো ঠিকেদের বাবুই বলে।

মালতী হঠাৎ নিজের গলা থেকে একগাছা সরু চেন হার খুলে টগরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—আগাম মজুরি দিলাম। একদিন নিয়ে আসতে হবে, বুঝতে পারছিস।

টগর ভয়ে কাঠ হয়ে বলে—এ কী কাণ্ড করলে গো বৌরাণী! এ যে বড় কঠিন হুকুম। মুখপোড়া যে বাবুর সঙ্গ ছাড়ে না। তাছাড়া কেমন যেন কাটখোট্টা। দাসী-বাঁদীদের দিকে তো তাকিয়েও দেখে না। মেয়েমানুষ মাত্রেই যেন আক্রোশ।

—ওজর আপত্তি রাখ্। কার্য সমাধা করতে পারলে বখশিশ পাবি।

—সে তো বুঝলাম বৌরাণী—চেনটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে টগর ভয়-ভয় হৃষ্টচিত্তে বলে—কিন্তু কাজটা যে একেবারে অসম্ভবের অসম্ভব। দিনের বেলায় যে মুখপোড়া কোথায় থাকে, কোথায় খায়-দায় কে জানে।

—ওই মড়ি পোড়াটাকে হাত কর্। ও নিশ্চয় জানে।

—দেখি। কি হয়। তোমার আদেশ তো কখনো না করি নি। দেখি।

—পিস-শাশুড়ী যেন টের না পায়। তা হলে বৌদিদি মন্দ, এই ছুতোয় ছেলেকে ইদিকে আসতে দেবে না। একের নম্বর ঘুঘু তো! দেখিস না, ঠাকুরপোকে একটু ডাকলেই কি রকম বেজার হয়!

—ঢং! তোমার পিস-শাশুড়ীর ঢং দেখে বাঁচি না! বলি এতই যদি গোঁসাইগিরি, রাজা বাদশার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিস কেন তবে? মেয়েটাকে পারে তো কৌটায় ভরে রাখে।

—তবু তো শুনি—মালতী টিটকিরির হাসি হেসে বলে—ছোট-বাবুর ঘরে আনাগোনা।

—ও বাবা! বৌরাণী যে দেখছি ঘরে বসেই জগতের সকল কারখানার হিসেব রাখে—হেসে গড়িয়ে পড়ে টগর। বলে—বুঝতে পারে না বুড়ি। ঘরে ছোট বৌরাণী থাকে কি না।

—হ্যাঁলা বলিস কি! ঘরে ছোটগিন্নী থাকে? তার চোখের ওপর?

—আর বলি কি! মানুষের মন এক জাহাজী কারখানা, বুঝলে বড় বৌরাণী। সেখানে যে কত কলকব্জা, কত গড়ন-পেটন! ছোট গিন্নী তো নিজেই সাজিয়ে গুজিয়ে সামনে এগিয়ে দেয় 'পান দিয়ে আয় জল দিয়ে আয়' বলে।

ধন্যি বাবা! তা—কমলি ছুঁড়ি কাঁদে না?

—কাঁদত। প্রথম প্রথম কাঁদত। এখন বশ হয়ে গেছে। এখন বরং মায়ের চোখে ধুলো দেবার তাল খোঁজে। আর সত্যি কথা, পাবে কোথায় ছোটবাবুর মতন অমন নব কার্ত্তিকটি! ছোট বৌরাণী

যেন ওনার কাছে দিদিমা।

—কেন লো! শুনি নাকি আমি পাঁকাটি—মাংস বেচে খেয়েছি। উনিই আসল রূপুসী।

—কে বলে? ছোটগিন্নীর চেলা-চামুণ্ডীরা তো? বলুক। তোমাকে এখনো বিয়ে দিলে বিয়ে দিয়ে আনা যায়। আর ছোট বৌরাণী? হি হি হি! আবার তো কাল স্যাকরা এসেছিল। বালা গড়াতে গেল।

—তা ভাল। মাপে ছোট গহনাগুলো তোদের বিলোয়?

—ইস! তেমনি নজর যে! এ তুমি কি না। হ্যাঁ, ভাল কথা, আজ যে ওনার ঘরে ওঘরের দাদাবাবুর নেমন্তন্ন।

—তাই নাকি? ঠিকরে ওঠে মালতী।—কে বললে?

—নিজের চক্ষে দেখে এলাম। সায়েব বাড়ির 'খানা' এসেছে। রূপোর কাঁটা চামচ বেরিয়েছে। ছাওরের নাকি জম্‌মো দিন।

—মুটকী-হাতী জানে ঢের। যাক গে, মরুক গে। করবে আর কি! বলে আপনার বরকেই ঘরে ধরে রাখতে 'বাই' জন্মায়, রাখতে 'অন্য লোক' লাগে! তুলোর গাঁট—দেহের ভারেই রাতদিন হাঁসফাঁস! ছাড়্ ওর কথা! তুই আমার হুকুম মনে রাখবি তো?

—মনে তো রাখব বৌদিদি। তবে কাজটা বড় কঠিন।

—মোচড় দিচ্ছিস বুঝি? আচ্ছা পাবি মোটা বখশিশ। কিন্তু লোকটাকে আমার একবার দেখা চাই-ই চাই। দেখব, কোন্ মন্তরে বড়বাবুকে এত বশ করেছে। মোছলমান যখন নয়, তখন ভয় খাই না। বেটাছেলের সামনে বেরোতে নেই, কথা কইতে নেই, এই যে হয়েছে বিপদ। নইলে দিনে-দুপুরে লোকের সামনে দিয়ে ডাকিয়ে আনতাম, তোদের এত খোশামোদ করতাম না।

॥ তেরো ॥

এই হল দে চৌধুরীদের অন্দর। দিন আর রাত্রির জোয়ার-ভাঁটা খেলা।

কিন্তু বাইরে? বাইরেই বা নতুন কী। সেখানেও দিনে আর রাত্রে অন্য ভুবন।

দিনের বেলা—সকালে, কি ঘুম না এলে দুপুরে, দাবার ছক পাতান গৌরীশঙ্কর। মোটা কাপড়ের উপর রেশমী সুতোয় নক্সা তোলা দামী ছক। হাতীর দাঁতের তৈরী ঘুঁটি। চাকরকে দিয়ে ছক পাতিয়ে ডাক দেন পুরুত রাখাল ভট্চাযকে। সে এলে খেলা জমে ওঠে।

রাখাল ভট্চায খেলেন ভাল। মাথা পরিষ্কার। কিন্তু প্রথম প্রথম 'বাবু'র ওপর জিতে যাবার ভয়ে, ইচ্ছে করে ভুল 'চাল' দেওয়ার চাল করেছিলেন।

সে চাল ধরা পড়তে দেরী হল না গৌরীশঙ্করের অভিজ্ঞ চোখে। দাবার ছক উল্টে দিলেন গৌরীশঙ্কর। বললেন—গৌরীশঙ্কর দে চৌধুরী 'এলেবেলে' খেলে না ভট্চায, কৃপা প্রদর্শন করতে এসো না।

ভট্চায তো কাঠ।

এ ভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর সময় লেগেছিল।

অতঃপর এখন প্রায়শঃ ভট্চাযই জেতেন।

গৌরীশঙ্কর 'কেয়াবাৎ' দেন।

মাঝে মাঝে খুশী হয়ে বখশিশ করে বসেন।

পুরুতের ছেলে, বখশিশ কথাটা শুনতে খারাপ, তাই সে বখশিশ যায় চাদর কাপড় বাসন ছাতা জুতোর বেশে।

মাঝে মাঝে তাস খেলেন বাজি ধরে, মোসাহেবদের ডেকে। বিকেল হলে ফল মিষ্টি ছানা মাখনের ভোগ। সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু ওই—সন্ধ্যে হলেই বদলে গেল ভোল। তখন বোতল নামল গেলাস নামল, বাঈজীদের ঘুঙুরের বোল ফুটল। যারা প্রসাদলোভী, ধারে-কাছে ঘোরে, বাবুরা তাদের কাউকে বলেন 'হারামজাদা', কাউকে বলেন 'বাপধন'। কাউকে নিজের গলার বেলফুলের মালা খুলে বখশিশ দেন, কাউকে চটি ছুঁড়ে মারেন। মেজাজের ঠিকঠাক থাকে না। কিন্তু নিয়মী। দুপুর রাতের পর আর বৈঠকখানায় থাকেন না। চাকরদের হুকুম দেওয়া আছে, তারা টেনে তুলে নিয়ে যায়।

ভবানীশঙ্করের খেলার নেশা নেই। আছে শুধু দুটি মোক্ষম নেশা তা একটাতে দাদাও সঙ্গী। দুই ভাই এক বোতল থেকে মদ ঢেলে খান, এক বাঈজীকে 'কেয়াবাৎ' দেন।...কিন্তু সম্প্রতি মুশকিল করেছে ওই ঠিকেদার। গৌরীশঙ্কর বড় বেশী তফাত হয়ে গেছেন। চোর-কুঠুরির চোরা পথে তাঁর রাতের আসর বসছে।

রাম মুখুজ্যে এসে হাত কচলায়—হুজুর, পালকি চাই।

হুজুর বলেন—এবার কোথা থেকে জোটালে?

—আজ্ঞে সে কি এখানের! সেই ওতোরপাড়া থেকে—

—বয়েস কত?

—আজ্ঞে আঠারো উনিশ।

—দেখতে কেমন?

—আপনি নিজে দেখে বিচার করবেন হুজুর। তার পর যা বিবেচনা হয়—

—পালকি ভাড়া চাই? বলি কত টাকা যেন দাদন নিয়েছিলে হে মুখুজ্যে?

—আজ্ঞে ওসব ছেঁড়া কথা আপনাদের মনে রাখা শোভা পায় না হুজুর।

—হুঁ! তুমি ভারী ঘুঘু মুখুজ্যে।

—আজ্ঞে বাবু ঘুঘু না হলে আর এই কাজে নামতে পারি?

—তা বটে। বলি এতাবৎ কটা হল?

—আজ্ঞে এই সাতটা।

—কুল্লে সাতটা! গৌরীশঙ্কর অবাক হন। আমার যে মনে হচ্ছে এককুড়ি পেরিয়ে এল!

—আজ্ঞে কি যে বলেন! শুনছি না?

—দেখো মুখুজ্যে, ঠিকেদারের কথাটা তোমার সত্যি বলে মনে হয়?

মুখুজ্যে চকিত হয়ে বলে—কোন্ কথা?

—ওই পরমায়ু বাড়ার কথা।

ঠিকাদারের কথার অবিশ্বাস প্রকাশ করলে মুখুজ্যের ব্যবসায় 'দ' পড়ে। ব্যস্ত হয়ে বলে—আজ্ঞে, অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। জগতে কত কি আছে।

—কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় কি মনে হয় জানো মুখুজ্যে, নিজের পরমায়ু বাড়াবার জন্যে এতগুলো ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার জাত-কুল খাচ্ছি, এতে মহাপাতক হচ্ছে না?

মুখুজ্যে সাত হাত জিভ কেটে গলার উড়ুনিটাকে গামছা-মোড়া দিয়ে বলে—বলেন কি বাবু! মহাপাতক? আপনাদের মত মহাপুরুষদের জীবনের দামের কাছে তুচ্ছ দু-দশটা মেয়েমানুষের জাত-কুল। বলি কটা যুবতী বিধবা ভাল থাকছে? ভাল থাকতে পাচ্ছে? এ তো তবু একটা পুণ্যকাজে দেহ উৎসর্গ করে স্বর্গের সিঁড়ি বানাচ্ছে। আপনি তো তাদের পাপচক্ষে দেখছেন না! শুধু একটা সাধনার জন্যে—

গৌরীশঙ্কর আলবোলায় ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে বলেন—পাপচক্ষে যে দেখছি না—তা বলি কি করে মুখুজ্যে? মনের অগোচর তো পাপ নেই।

—আজ্ঞে তা দেখে থাকলেও ছুঁড়িরা স্বর্গে যাবে। বলি বাড়িতে তো ভাই-ভাজের কি ভাসুর-জাওরের লাথি খেয়ে জীবন কাটাচ্ছিস, এ তো তবু দুদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকছে।

—কিন্তু ওরা অত কাঁদে কেন বল তো মুখুজ্যে? মোটা টাকা দিয়ে ছেড়ে দেব বলেছি, তবু কাঁদে। ওই কান্না কান্না দেখলেই কেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়।

মুখুজ্যে মাথা চুলকে বলে—আজ্ঞে কাঁদে কেন? ছেড়ে দেবেন, সেটাই তো ভয়। ঘরে তো আর ঠাঁই হবে না ওদের। তাই ছেড়ে দেওয়া শুনলে ভয় পায়। যদি চিরদিনের আশ্রয় পাবার আশা থাকতো, কাঁদতো না।

গৌরীশঙ্কর বিচলিত স্বরে বলেন—চিরদিনের আশ্রয়! ওই এক-কুড়ি মেয়েকে আমি চিরদিনের আশ্রয় দেব মানে? রাখব কোথায়? নিয়ে করব কি?

—শ্রীকৃষ্ণের ষোলশো গোপিনী ছিল, নবাব বাদশাদের হারেমে অগুনতি—

—থাক, থাক, ওসব বড় বড় কথায় কাজ নেই মুখুজ্যে। ও আমার ধাতে সইবে না। ওদের নিয়ে—ভাবনা হচ্ছে।

—ভাবনার কি আছে বাবু, ওরা নিজেরাই আপন আপন পথ বেছে নেবে।

—না মুখুজ্যে, ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি নে। ঠিকেদারটা এমন একটা লোভ দেখাল! একশো আট বছর পরমায়ু, চিরযৌবন। কিন্তু তোমাদের রাণীমার কানে এসব পৌঁছলে—

—আজ্ঞে তাতে ভয় খাবেন না রাজাবাবু। পতির একশো আট বছর পরমায়ু হবে জানলে সাধ্বী সতী নিজেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

—না মুখুজ্যে, ঠিক তা নয়। সে জাতের মানুষ নয়। যাক গে, তুমি সরকারের কাছে পালকি ভাড়াটা লিখিয়ে নাও গে। কি জন্যে পালকি কি দরকার শুধোবে যে। মনে আছে তো কি বলবে?

—আজ্ঞে তা আর মনে নেই? এই নিয়ে সাতবার হল। বলব—

—থাক থাক, আর শুনতে ইচ্ছে নেই। যাও, ঠিকেদারকে খবর দাও গে। সে তো আবার পালকির সঙ্গে সঙ্গে আসবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ওই এক বাতিক। কেন বলুন তো? এদিকে তো শুকদেবের অবতার, কিন্তু মেয়েগুলোকে মুখ বেঁধে আনবার সময় অত আগ বাড়িয়ে যায় কেন? লোকটাকে যেন তখন পিচাশে পায়। কী উল্লাস।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবি মুখুজ্যে, ওর এতে এত উল্লাস কেন? ও নিজে তো ভীষ্মদেব।

॥ চোদ্দ ॥

টগর বলে—সেই কথাই তো বলি বৌরাণী। মিন্‌সে নিজে তো ভাটপাড়ার মা গোঁসাই, কিন্তু বাবুকে নরকের দরজা চেনাবার এত শখ কেন? বাইরের নাচনাউলি আসত, তার মানে বুঝি। কিন্তু এ কী মহাপাপ। বলব কি বৌরাণী, মিন্‌সে যেন তখন আর কি হয়ে যায়। আড়ি পেতে দেখতে যাই তো চোরা কুঠুরি দিয়ে। দেখি মিন্‌সে বড়বাবুর দোর পাহারা দিচ্ছে। এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না, এই পাইচারি করছে, এই পাইচারি করছে। আর চোখদুটো যেন আগুনের ভাঁটার মতন জ্বলছে। আমার বিশ্বাস বৌরাণী ওই ঠিকেদার পিচাশসিদ্ধ। বড়বাবুর মাথাটা না খারাপ করে দেয়।

মালতী ওকে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বলে—সোনার হার গাপ করে বসে আছিস, আর কথার বুকনি কাটছিস। ওকে আনার কি হল?

—ব্যাপারটি তো সোজা নয় বৌরাণী। মুখপোড়ার কাছে ঘেঁষাই তো দায়। বলব কখন? নইলে ওই তোমার কুলুঙ্গীর পেছনের চোরা সিঁড়ি দিয়ে আনতে আর কতক্ষণ।

মালতী গুম্ হয়ে বলে—বেশ, আনতে না পারিস আমিই যাব।

—ওমা, কী সর্বনাশ। তুমি কোথা যাবে গো?

—কেন, নীচের তলার ওই চোর-কুঠুরিতে। যেখানে ও পাহারা দেয়।

—ও বৌরাণী, তার থেকে বরং তুমি আমার গর্দান নাও। বড়বাবু জানতে পারলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

—না রাখে মরবি। এত লোক মরছে, তুই চিরদিন অমর থাকবি নাকি?

তারপর সেই একদিন রাত্রে—মালতী নামল ওই চোরা সিঁড়ি দিয়ে—হ্যাঁ, ওই জোড়া কুলুঙ্গী, যেটা বুজিয়ে দিয়েছেন। ওটা একটা কুলুঙ্গী ছিল। ওর ভেতর দিকে হাত গলিয়ে দিলে নীচের দিকে একখানা কাঠের তক্তায় হাত ঠেকত। সেটা ঠেলে সরিয়ে দিলেই সিঁড়ির মুখ আলগা হয়ে যেত। আর ওই যে আপনার ত্থাল-আলমারি, ওর কপাট খুললেই ভেতরে তাকের বদলে ছিল রুজু রুজু সিঁড়ি।....না না, তাকিয়ে কোন লাভ নেই, ভেতরের সে সব কল-কৌশল ধসে পড়ে গেছে সেবারের ভূমিকম্পে। আগের মালিক আলমারিটার মধ্যে ফোকর দেখে ভয় খেয়ে দেয়াল তুলে দিয়েছিল। আপনি দিলেন বুজিয়ে জোড়া কুলুঙ্গীটা। কিন্তু তখন ওসব ছিল। বৌরাণীর শোবার ঘর থেকে সোজা নেমে যাওয়া যেত পাতাল-ঘরে। যে ঘরে বড়বাবু—

হ্যাঁ, তার পর টগর বলল—গায়ে গয়না থাকলে চলবে না বৌরাণী, শব্দ হবে। খসখসে শব্দ তোলা শাড়িও অচল।

গহনাগুলো একে একে খুলল মালতী। বিছানার ওপর সাজিয়ে রাখল। ভয়ের কিছু নেই, বাড়ির ভিতরের দিকের দরজা জানলা সব বন্ধ। হাতে শুধু দুগাছা শাঁখা, পরনে শাড়ি, দেওয়াল-আলমারীর কপাট খুলে সিঁড়িতে পা দিল মালতী। পিছনে মোমবাতি হাতে টগর।

ঘরের ঘড়িতে তখন রাত বারোটা। ঢং ঢং করে বাজছে একে একে।

চমকে উঠলাম।

এই নিষুতি রাতের—গা-ছমছমে অবকাশের সুযোগে, অতীত কালের কোনো এক থেমে-যাওয়া ঘড়ি কি সত্যিই বেজে উঠল ঢং ঢং

করে ?

হ্যাঁ, বাজছে।

প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বুকের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলে উঠছে থামি নি, থেমে যাই নি আমি। ইতিহাস কখনও চিরকালের মত থেমে যায় না। সে শুধু মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষের অবিশ্বাস্য অমানুষতায় পাথর হয়ে যায়।...

সেই পাথরে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় তার ভিতরের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস। তার পর কোন একদিন সহসা কেউ সেই দীর্ঘশ্বাসের ভাষাকে অনুভব করে, আবিষ্কার করে, আর আপন কল্পনার রং মিশিয়ে নতুন করে এঁকে তুলে ধরে জগতের সামনে।

ভেঙে যায় ইতিহাসের স্তব্ধতা, জেগে ওঠে পাষাণ-প্রতিমারা। তার ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি ওঠে।

বর্ষা বলল,—ও কি ?

তার চোখে আচ্ছন্নতা, তার মুখের চেহারায় ব্যাকুলতা।

—ও কি ? ও কিসের শব্দ ?

—কিছু না, আস্তে বললাম, আমাদের ঘড়িটাও বাজছে।

—কটা ? কটা—বাজল ?

—এগারোটা।

—এগারোটা ? না না, আমি যে এক এক করে গুনলাম বারোটা বাজল।

বললাম—না এগারোটাই। এই যে আমার হাতঘড়িটাতেও—

না, কথাটা শেষ করা হল না। বর্ষার একটা অস্ফুট আর্তনাদে চকিত হয়ে থেমে যেতে হল। অস্ফুট সেই আর্তনাদ কথা কয়ে উঠল—উনি কোথায় উঠে গেলেন ?

স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না।

বাস্তবিকই মানুষটা যাদুকর না কি ? কথা বলতে বলতে চার-জোড়া চোখের ওপর দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল কি করে। তখনও ঠিক

এই রকমই হয়েছিল। যে মানুষ পথে নেমে হারিয়ে গেল, সেই মানুষই তখুনি আবার—

—কী হল? অমন আকাশ-মুখো হয়ে কী দেখছেন?

হাসছেন ভদ্রলোক।

সেই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের জ্বালাভরা তীব্র হাসি।

—আপনাদের মত ভীতু লোক যে কোন্ সাহসে হানাবাড়ি কিনতে আসে তাই ভাবছি!….কী? বোধ করি মনে ভাবলেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা। তা, ভাবতে অবিশ্যি পারেন। ভাবলে অবাক হবার কিছু ছিল না। পারতাম মিলিয়ে যেতে। কিন্তু এখন গেলাম না। আপাতত হাওয়া হতে নয়, হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল—আপনার ঘরের মধ্যে। এ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে যে এখনও—

বুঝতে পারলাম, সেই ঘড়ি বাজার সময় আমাদের অন্যমনস্কতার অবকাশে ভদ্রলোক একবার উঠে গিয়ে বারান্দায় পাক দিয়ে এলেন। আবার যে উনি গুছিয়ে বসেন এ ইচ্ছে হচ্ছিল না। বলেও ছিলাম একবার—রাত অনেক হয়ে গেল না?

কিন্তু বর্ষা তখন নিজের ডুবজলের জন্যে নিজে খাল খুঁড়ছে।

—না না, রাত হয় নি—বর্ষা উত্তেজিত—সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে মালতী কি করল বলুন? কি হল তার শেষ পর্যন্ত?

আমি অস্বস্তিতে অস্থির হই। বলি—থাক না, কাল না হয় শোনা যাবে। উনি তো এই অঞ্চলেই থাকেন, কাল বরং বেলা থাকতে এসে—

হঠাৎ আবার শুরু হয়ে গেল সেই হাসি। যে হাসির শব্দে বুকের ভিতর হিম হয়ে যায়।

হাসির ধমক থামিয়ে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—কে বললে আপনাকে আমি এই অঞ্চলেই থাকি? বলেছি নাকি?

ভয় ভয় করছে, তবু মনে সাহস সঞ্চয় করে বলি—তাহলে তো আরও উচিত নয় আপনাকে আটকে রাখা। তা ছাড়া—অতীত

কথা শুনেই বা কী হবে? আমরা বর্তমানের জীব, আমাদের যুগ নিয়েই আমাদের কারবার।

ভাবছি এই অবহেলা-বাক্যে ভদ্রলোক নির্ঘাত অপমানাহত হয়ে চলে যাবেন, আমার পক্ষে শাপে বর হবে।

কিন্তু হরি! হরি! আমার ঘরেই ঘরভেদী বিভীষণ। বর্ষা আমার কথা শেষ হতে না হতেই বলে ওঠে—বাঃ, বেশ বলেছ। অতীতকে জানবার দরকার নেই! তাহলে লোকে ইতিহাস পড়ে কেন?

'ক্ষুব্ধ আহত' কোনও কিছুই না হয়ে বরং ভদ্রলোক উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

—ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছ মা-লক্ষ্মী। অতীতকে অগ্রাহ্য করলে চলবে কেন? অতীত আছে, তাই না বর্তমান আছে? ইতিহাস জানা চাই বৈকি। সব কিছুরই ইতিহাস জানা চাই। তা নইলে কোটি কোটি বছরের পাথর খুঁড়ে কেন মানুষ পৃথিবীর বয়েস জানতে চাইছে? কোথাও এক টুকরো হাড় কুড়িয়ে পেয়ে কেন আবিষ্কার করতে বসছে কিসের কি বিত্তান্ত। বংশের ইতিহাস, বাড়ির ইতিহাস সবই দরকার। এই যে আপনি না জেনে না শুনে বাড়িখানা কিনে বসলেন!....এর ইতিহাস জানা থাকলে কি আর চট করে কিনতে সাহস করতেন? একটু আগুপিছু ভাবতেন—

ঘরভেদী বিভীষণ আবার কথা কয়ে ওঠে—হ্যাঁ, ভাবতেন না ছাই! সেই মানুষ যে! না ভাবা না চিন্তা, না কাউকে জিজ্ঞেসবাদ, কিনে বসলেন একখানা ভাঙা অট্টালিকা। কম বারণ করেছি? তা, কে শোনে কার কথা! কিনা সস্তায় পাচ্ছি—দাঁও পাচ্ছি—

—হা হা হা! সেই কথাই তো বলছিলাম এই সারা-জগৎ কেবল দাঁওয়ের তালে ঘুরছে। দাঁও যে শেষ অবধি বিশ বাঁও জলের নীচে গিয়ে ঠেকে সে জ্ঞান তো নেই। নইলে ওই রাম মুখুজ্যেও তো দাঁও মারতে গিয়েছিল। আর গৌরীশঙ্করও ভেবেছিলেন—বেশ দাঁওয়ে পাওয়া গেল। তৃণস্য-তৃণ টগর, সেও—

—আপনি মালতীর কি হল সেইটা শুধু বলুন।

বলে গুছিয়ে বসে বর্ষা।

অর্থাৎ আমার হিতোপদেশে কর্ণপাতমাত্র করবে না।

ভদ্রলোক যে আমার অবস্থা বুঝে বেশ মজা পাচ্ছেন, এবং সে অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন, সেইটা বুঝেই রাগে মাথা জ্বলে যাচ্ছিল আমার। এই বিশ্রী লোকটা চলে গেলেই বর্ষাকে যে কী বকা বকব তা মনই জানছে।

আশ্চর্য!

মেয়েমানুষের কৌতূহল কেন এমন অপরিসীম? যে মালতীকে সে চক্ষে দেখে নি, তার 'শেষ' কথা না শুনে ওর খেয়ে হজম হবে না। বিরক্ত রুক্ষস্বরে বলি—নিন মশাই, বলে ফেলুন আপনার মালতী-কাহিনী। নইলে এনার তো আজ আর—

—মালতী! হ্যাঁ গৌরীশঙ্করের পরিবার মালতী। কিন্তু তার আগে যে গৌরীশঙ্করের পিসি প্রভাবতীর কথা রয়েছে। ডাকনাম ছিল 'বুড়ি'। কিন্তু ডাকনাম ধরে ডাকবার লোক আর তখন ত্রিসংসারে নেই তার। এক ওই গৌরীশঙ্করের কাকা। কিন্তু সেও তো নানান গোলমেলে ব্যাপার। কাকা আর পিসি, কিন্তু দুজনে সত্যিকার ভাই বোন নয়। মামাতো কাকা আর পিসতুতো পিসি না কি ওই রকম কি একটা জটিল সম্পর্ক ছিল। তবু ওই কাকা নাকি কবে 'বুড়ি' বলে ডেকে আত্মীয়তা জানাতে গিয়েছিলেন, আর প্রভাবতী নাকি তাঁকে হাতে ছিল কোশাকুশি তাই ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ঈশ্বর জানেন ভেতরের কথা।

তবে সে গোলমাল এখানে নয়, এ বাড়িতে নয়; গৌরীশঙ্করের আগের আস্তানায়। শোনা কথা। যে সময়ের কাহিনী, তখন প্রভাবতীর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। সেকালে তাকেই লোকে বুড়ো হওয়া বলতো।...হ্যাঁ, এ-কথা আপনি বলতে পারেন—গৌরীশঙ্করদের বাপ তো ছিল ঘরজামাই, মাতামহর আশ্রয়ে তো মানুষ হয়েছে ওরা দুই ভাই, সে বাড়িতে পিসি কাকা আসে কোথা

থেকে ? আসার কথা নয়, তবু এসেছিল। গৌরীশঙ্করের বাপ ঘর-জামাই হলেও তার জন্যে আলাদা বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থা ছিল। আর মানুষটা ছিলেন হৃদয়বান। স্রোতের শ্যাওলা যেমন ভাসতে ভাসতে নদীর কিনারায় এসে ঠেকে, দুঃস্থ অভাবী মানুষরাও তেমনি ভাসতে ভাসতে হৃদয়বান আত্মীয়ের কাছে এসে ঠেকে। থেকে যায়, আশ্রয় পায়।

প্রভাবতী যখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হলেন, তখন তাঁর নিকট-আত্মীয়রা মুখ ফেরাল। কারণ প্রভাবতী দুঃস্থ, প্রভাবতী অভাবী। প্রভাবতীর স্বামী নিতান্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলে ছিলেন, তাছাড়া—যতদিন বেঁচে ছিলেন অর্থোপার্জনের থেকে বেশি সময় দিতেন বিদ্যে-উপার্জনে!

তা বিদ্যের ছালা নিয়ে তিনি তো সরে পড়লেন প্রভাবতীর হাতে ভিক্ষের ডালা তুলে দিয়ে। প্রভাবতী কিছুদিন যাবৎ স্রোতের শ্যাওলার মত ভাসল, তারপর ঘর-জামাই মামাতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গৌরীশঙ্করের তখন সবে বিয়ে হয়েছে, ভবানীর বিয়ের তোড়জোড় চলছে।

ভাই বললেন—এতদিন এই হাড়ির হালে কাটিয়েছিস লক্ষ্মীছাড়ি, আমার কাছে এসে পড়তে পারিস নি ? নাকি ঘর-জামাই দাদাকে মনিষ্যি বলে মনে হয় নি ? আরে বাবা শ্বশুরের পয়সা সগুষ্ঠিতে মিলে যতটা লুটেপুটে নিতে পারা যায়, তা নিতে হয়, এ খেয়াল নেই ?

গৌরীশঙ্করের মা বলেছিলেন—কথার কি ছিরি! এসো ঠাকুরঝি।

এসব গৌরীশঙ্করই গল্প করতো, ভবানী কোনও দিনই মা বাপের নামে ছেদ্দাভক্তি করতো না। গৌরীশঙ্কর বলতো—মা ছিলেন সাক্ষাৎ দেবী। সেই যে 'এস' বললেন, একেবারে পুরো মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন ননদকে। বললেন গুরুজনকে 'আশ্রিত' ভাবার অভ্যেস হয়, এমন শিক্ষা আমি দিতে চাই না ছেলেদের।

তা ক'দিনই বা ছিলেন তিনি তার পর ? চলে গেলেন। তার পর কর্তাও গেলেন। পিসি রইলেন মায়ের স্থানে।

কিন্তু কালের প্রবাহে এই পৃথিবীখানারই গড়ন বদলায়, তা মানুষের সংসারের। তবু বাইরের ঠাট বজায় আছে তখনও।

কাকাটা অবিশ্যি এসেছিলেন পরে অন্য ভাবে।

স্রেফ নেশা-ভাঙ করবার পয়সা যোগাড় করতে দূর-সম্পর্কের ভাইপোর গলায় গিয়ে ওঠা। তা ভাইপোর থেকে ভাইপোর মামাদের কাছেই তাঁর জমতো ভাল। গৌরীশঙ্করদের মামাদের মোসাহেবী করাই কাজ ছিল তাঁর।

গৌরীশঙ্কর যখন মামাদের আশ্রয় থেকে বাস উঠিয়ে চলে এলেন, তিনি নাকি আসতে চান নি। এক রকম জোর করেই নিয়ে আসা হয়েছে। লোকটা যেন নর্দমার ছুঁচো ছিল। ওকে ঘেন্না করতেও ঘেন্না হতো।

প্রভাবতী গরীবের মেয়ে, গরীবের বৌ। কিন্তু ঐশ্বর্য দেখে কখনও তাঁর মাথা বিগড়োয় নি। তিনি আশ্রয়দাতাকে না করেছেন তোয়াজ, না করেছেন আয়েস। নিতান্ত যতটুকু নইলে নয়, তার এতটুকু বেশী কখনও গ্রহণ করেন নি।

কবে নাকি ভবানীর বৌ চারুহাসিনী স্বামীর কাছে অগ্রাহ্য দেখিয়েছিল,—বিধবা মানুষরা কত বারব্রত করে দেখতে পাই, তোমাদের পিসিকে কখনও একটা ব্রত করতে দেখলাম না ওই যা করছেন একাদশী। বিধবার একাদশী তো নিষ্ফলা ব্রত। ওতে আর হচ্ছে কি? এ জন্ম তো এই দুঃখদৈন্যে কাটল, পরজন্মের জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে করে না? বুঝি না বাবা বেম্ম না খ্রীস্টান!

কথাটা ঝট করে ভবানীর মনে লেগে গিয়েছিল।

তাই একদিন খেতে বসে নাকি কথা তুলেছিল—পিসিমা, তুমি কোনও ব্রত পূজো করো না কেন গো?

প্রভাবতী হেসে বলেছিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন রে?

—না তাই জিজ্ঞেস করছি। বিধবা গিন্নীটিন্নীরা তো করে এসব।

প্রভাবতী বলেছিলেন—কত লোক কত কি করে বাবা, সবাই কি

একরকম ?

ভবানী উদারতা দেখিয়েছিল—তা ওসব ব্রতট্রত করা তো ভাল। পরজন্মে ভাল হয়। তুমি যদি করতে চাও করো না, টাকার জন্যে আটকাবে না। নায়েব মশায়কে বলে দেব আমার খাত থেকে যেন পিসিমা যা চান তা দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের মাসী-টাসীকে তো দেখেছি অনন্ত চতুর্দশী তাল নবমী এই সব কত কি করতে—

প্রভাবতী হেসে বলেছিলেন অনন্ত সংগ্রামের বস্ত করলে আর কিছু করতে হয় না রে ভবানী।

ভবানী অবাক হয়ে বলেছিল—ও রকম কোনও ব্রত আছে না কি ?

—আছে বৈ কি।

ভবানী বোধকরি আশ্বস্ত হয়েছিল স্ত্রীর কাছে মুখ থাকল ভেবে। হৃষ্ট চিত্তে বলেছিল—বাবা, তোমাদের মেয়েদের যে কত রকমই আছে। ওই সব পুরুত বামনাদের কারসাজি আর কি। তা ব্রত উদ্‌যাপনে তো খরচ আছে ? দরকার হলে বোলো। জানতে পারি যেন।

প্রভাবতী বলেছিলেন—উদ্‌যাপন যদি করতে পারি সেদিন সবাই জানতে পারবে বাবা। দেরী আছে।

ভবানী ঘরে গিয়ে বলেছিল—না জেনে-শুনে এমন একটা কথা বল। পিসিমা তো খুব কঠিন কি একটা ব্রত করছেন। সংগ্রাম না কি যেন—

চারুহাসিনী কটমটিয়ে তাকিয়ে বলেছিল—তোমার বুদ্ধি দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে আমার।

ভবানী হেসে উঠে বলেছিল—চেষ্টা কোরো না, চেষ্টা কোরো না, দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। তোমায় ঝোলাতে পারে এমন মজবুত দড়ি কি বাজারে মিলবে ?

চারুহাসিনী আড়ালে গিয়ে আঙুল মটকায়।

চাঁপাকলার মত আঙুল তার মটকালে শব্দ ওঠে না, তবু মটকায়।

কার উদ্দেশে কে জানে।

দূর-সম্পর্কের পিস্‌শাশুড়ীকে যে গুরুজনের মর্যাদা দিতে হয়, এটা বিরক্তিকর। সেই পিস্‌শাশুড়ী যে একতিল খোশামোদ করে না এটা অসহ্য। পিস্‌শাশুড়ীর ছেলেটা যে চারুহাসিনীর থেকে মালতীর বেশী ন্যাওটা, এটা গাত্রদাহী।

পিস্‌শাশুড়ীর মেয়েটাকে নষ্ট করবার কুৎসিত ইচ্ছে তার বোধহয় ওই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে।

মালতী অন্য রকম।

মালতী আত্মসুখী।

মালতী দুঃসাহসী।

মালতী নীচ নয়। মালতী বলে—পিস্‌শাশুড়ীটি আছেন তাই গায়ে হাওয়াটি লাগিয়ে আছি বাবা। নইলে ওই রান্না-মহল ভাঁড়ার-মহল ঠাকুরসেবা সব ছিষ্টির দায় এসে ঘাড়ে চাপতো। এ বাবা ওপর ওপর একটু চন্দন ঘষলাম, দুটো ফল কাটলাম, হয়ে গেল।

টগর ঠোঁট উল্টে বলতো, বড় বৌরাণীর এক কথা। কাজ করার লোকের অভাব আছে? ভাত ছড়ালে কত কাগ আসে। এই আমরাই কি পারি না রান্নামহল তদারক করতে? না বামুন-মেয়েই পারে না ঠাকুরঘরের—

মালতী মুখ ঝামটা দিয়ে বলতো—থাম থাম, কিসে আর কিসে সোনা আর সীসে। আপনার লোকের সঙ্গে মাইনে করা লোক!

তা দুই বৌয়ের মনোভাব যাই হোক,—সকালে স্নান সেরে এ-বাড়ির প্রথামত প্রণাম করতো গিয়ে প্রভাবতীকে দুজনেই।

বর্ষা হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে বলে—আপনি মালতীর কথাটা শেষ করুন না।

—মালতী? আহা, ওই তো বললাম মালতীর আগে প্রভাবতী। মালতী যখন সেই চোরা সিঁড়িতে পা ফেলল—

তখনও মহলে প্রভাবতী ঠায় বসে আছেন ইষ্টদেবতার চিত্রপটের

সামনে। হেমন্ত এখনও ছোট বৌরাণীর ঘরের নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরে নি। আগে জপে বসেছিলেন প্রভাবতী। এখন আর জপে মন বসাতে পারছেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন। কোথায় যেন একটা বেড়াল কাঁদছে, দূরে কতকগুলো কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ শব্দ কানকে ধাক্কা মেরেই চলেছে। প্রভাবতীর কান আছে একটি বিশেষ পদশব্দের অপেক্ষায়।

কমলা ঘুমোচ্ছে চৌকীর উপর। ঘুমন্ত মুখটা তার এখন নিতান্ত বালিকার মত দেখাচ্ছে। নিষ্পাপ কোমল মুখখানি। প্রভাবতী মা হয়ে রক্ষা করতে পারছেন না ওই কোমলতাটুকু। আর তাঁর একুশ বছরের ছেলে হেমন্ত?

যে ছেলে ইস্কুলের পড়া শেষ করে আরও যে নতুন বড় ইস্কুল খুলেছে সায়েবরা সেখানে পড়তে যাচ্ছে। যার জন্যে মাস্টার আসছে নিত্য। সেই ছেলেকেই বা প্রভাবতী রক্ষা করতে পারবেন কোন্ শক্তির জোরে?

রাতের অন্ধকারে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যাবেন প্রভাবতী এই পাপপুরী থেকে? গিয়ে? কোথায় দাঁড়াবেন, কি খাওয়াবেন ওদের? কি উপায়ে পড়া সাঙ্গ করাবেন ছেলের? আর কমলা? চারখানা দেয়ালের আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়ে এমন জায়গা এক্ষুনি কোথায় পাবেন, যেখানে ওকে এর চেয়ে ভাল করে রক্ষা করা যাবে? অত বড় মেয়ে, এখনও বিয়ে দিতে পারলেন না প্রভাবতী। কথা তুললে ভাইপোরা হেসে ওড়ায়। তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েকে কতদিন আর দশ-এগারো বলে চালানো যাবে? কমলার বিয়েটা হয়ে গেলে হয়তো প্রভাবতী মনকে সঙ্কল্পে স্থির করতে পারতেন, ছেলে নিয়ে যেখানে হোক চলে যেতেন।

কিন্তু আজ প্রভাবতী সঙ্কল্পে স্থির হয়েছেন। কমলার বিয়ে না হলেও। আজ হেমন্ত এসে দাঁড়ালেই বলবেন, হেমন্ত, ধর্মের বদলে অন্ন কেনার যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না। তুই বড় হয়েছিস, মাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দে। আর তুই? যদি মানুষের মতন মানুষ

হওয়া তোর কপালে থাকে, তা হবি। আত্মাকে কলুষিত করে যে, মানুষ হওয়া তার মুখে ছাই।

প্রভাবতী জানেন তাঁর ছেলে সরল পবিত্র, শুধু ডাকিনীদের ভয়েই—

জানেন অনেক উচ্চাশা হেমন্তর। সেই উচ্চাশার ধ্রুবতারায় লক্ষ্য রেখে পায়ের নীচের পাঁককে চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে চাইছে ও। কিন্তু হেমন্ত তুই তো জানিস না, পাঁকের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হওয়া বড় কঠিন। আকাশের তারা আকাশেই থাকে, সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে উঁচুতে তুলে নেয় না।

সাড়ে বারোটার একটা ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। প্রভাবতী উত্তরোত্তর চঞ্চল হচ্ছেন, উত্তেজিত হচ্ছেন, আর বসে থাকতে পারছেন না। রাত গভীর হলেই যেন এই বাড়ির কোন পাতালপুরী থেকে চাপা আর্তনাদ ওঠে, মনে হয় কোথায় যেন ভয়ানক কি একটা ঘটছে।

ছেলে-মেয়ে ঘরে থাকলে, তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলে, প্রভাবতী ওই আর্তনাদকে আমল দেন না, মনের ভ্রম ভেবে ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে ইষ্টনাম জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙতেই কানে আসে রাখাল ভট্চাযের উচ্চরবে স্তোত্রপাঠের ধ্বনি। বাগানের ফুল বিল্বপত্র চয়ন করতে করতে রাখাল ভট্চায এ কাজটা সেরে ফেলেন।

স্নান সেরে আসেন প্রভাবতী, তখন মঙ্গলারতির ঘণ্টা-কাঁসর বেজে ওঠে, ঘুমন্ত বিগ্রহ জাগেন। প্রথম ভোরের আলো এসে ঠাকুর-দালানের কার্নিশে পড়ে, ধূপ-ধুনো আর সদ্যফোটা ফুলের গন্ধে বাতাস পবিত্র হয়ে ওঠে, রাতের কল্পনাগুলো তখন অলীক মনে হয়। আর এই ঘর দালান উঠোন চকমিলানো বারান্দা, মার্বেল পাথরে মোড়া ঠাকুরদালান এসব আবেষ্টন ছেড়ে অকূলে ভাসতে যাওয়ার ইচ্ছেটা নেহাৎ হাস্যকর ঠেকে।

তখন লাল-পাড় গরদের শাড়ির আঁচল গলায় ঘেরা মালতী আর

চারুহাসিনী প্রণাম করতে আসে, তাদের সন্তস্নাত চুলের গোড়ায় গোড়ায় জলবিন্দু লেগে থাকে, প্রভাবতী সেদিকে তাকিয়ে একটা অপরাধ-বোধের ভারে পীড়িত না হয়ে পারেন না। হাত বাড়িয়ে ওদের চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেও বাধে না তখন প্রভাবতীর।

এমনি করেই চলে দিন আর রাতের লুকোচুরি খেলা। কিন্তু আজ আর প্রভাবতী দিনের আলোর হাতে ঠকবেন না। প্রতীক্ষা করে জেগে বসে থাকবেন হেমন্ত কখন ফেরে। রাতের মধ্যেই যা হোক কিছু একটা করবেন।

॥ পনেরো ॥

ও-ঘরে চারুহাসিনী তখন তার ভারী হাতের থাবার মধ্যে হেমন্তর অনিচ্ছায় কঠিন, আতঙ্কে আড়ষ্ট একটা হাত চেপে ধরে রেখে বলছে—বাবা, বাবা! আমি সাপ না বাঘ যে অত ভয় খাচ্ছ? দেওর হও, ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক, দুটো ঠাট্টা-তামাশা গাল-গল্প করছি বৈ তো। তোমায় রাতে আটকে রাখতে চাইছি না গো? আর চাইলেই বা সুবিধে কোথা? ওদিকে মালিকবাবু খুব হুঁশিয়ার। জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, দুপুর রাত পার হলেই এসে যাবেন ঠিক। কিন্তু এতখানি ফাঁকা সময় কি করে কাটে বল তো ভাই?

হেমন্ত হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে অপ্রতিভ হেসে বলে—বাঃ, এই তো হল গল্প-টল্প। খাওয়া হয়েছে প্রচুর, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—বলি ঠাকুরপো, খোকাটি তো আর নও। বিয়ের বয়েস তো হয়েছে। বিয়ে হলে তখন ঘুম পাচ্ছে বলে বৌয়ের কাছে ছাড়ান পাবে?

—কে করছে বিয়ে!

—ও মা সত্যি! চারুহাসিনী গভীর রাত্রির স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—সন্নিসী হবে? না কাউকে

নিয়ে দেশান্তরী হবে?

—আঃ! এমন সব ঠাট্টা করেন আপনি! যাই, যেতে দিন।

—আমার কাছে এলেই খালি ছাড়ুন ছাড়ুন, যেতে দিন যেতে দিন। বলি ঠাকুরপো, বড়গিন্নীর ঘরে গেলে তো সময়ের জ্ঞান থাকে না!

হেমন্ত দৃঢ় গলায় বলে—বড়বৌরাণী আমার কাছে ইংরিজি পড়া শেখেন।

—কী? কী শেখেন বড়গিন্নী? পড়া?

—হ্যাঁ, ইংরিজি পড়া।

—বল কি ঠাকুরপো, তুমি যে আমাকে অবাক করলে। মেয়েমানুষের এত সাহস! বিধবা হবার ভয় নেই?

—কে বলেছে ও কথা? কে বলেছে ইংরিজি শিখলে মেয়েমানুষ বিধবা হয়?

—বিশ্বসুদ্ধ লোকই বলছে।

—যতসব বাজে কথা। কেউ বলে না। শুধু এই আপনারাই বলেন।

—হুঁ, বুঝেছি। তুমি বেড়াও ডালে ডালে ঠাকুরপো, তো আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। আর কিছু নয়, ওই একটা ছল সৃষ্টি করে মেলামেশাটা বেপরোয়া করার সুবিধে। মানে হচ্ছে, 'আহা মনে কিছু পাপ নেই গো আমার, বিদ্যেবতী আমি বিদ্যে করছি।' জগতের মানুষ তা বলে এত বোকা নয় ঠাকুরপো. যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে মাছ দেখতে পাবে না।

—কী মুশকিল! কি বকছেন আবোল-তাবোল! সত্যি বড্ড ঘুম পেয়েছে।

—আচ্ছা গো আচ্ছা, ছাড়ছি। বলি তোমার জন্যে তো বড়গিন্নী মাস্টার রেখে দিয়েছেন। নিজেও তার কাছে পড়লেই পারেন? তোমার ঘাড়ে কেন?

—সে কি! বৌরাণী মাস্টারের কাছে?

—কেন গো, তাতে এত কি দোষ হল? শুনেছি তো মাস্টার বুড়ো-হাবড়া। তোমার মতন এমন সুপুরুষ উঠতি যোয়ান দেওরের থেকে আর এত কি খারাপ?

—জানি না। আপনার খারাপ ভাল আমি বুঝি না। খেতে এসে এত দেরী করলে মা রাগ করেন।

—মা রাগ করেন! দপ করে জ্বলে ওঠে এতক্ষণের লীলাময়ী। বলে —কেন? রাগের কি আছে? গিলে খেয়ে ফেলছি আমি তার কচি খোকাটিকে? তার ছেলেমেয়েরা যে আমাদের কাছে আদর পায় এটা ভাগ্যের কথা, সে কথা তোমার মাকে মনে রাখতে বোলো ঠাকুরপো। আর এটাও বোলো, পরের বাড়িতে থাকতে হলে রাগটা একটু খাটো করতে হয়।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে মোটা দেহ নিয়ে ফুঁসতে থাকে চারুহাসিনী।

হেমন্ত মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে চলে যায়। এই পরের বাড়ির খোঁটা তাদের সঙ্গের সাথী, অঙ্গের আভরণ। চিরকাল এ খোঁটা খেয়ে আসতে হয়েছে। শুধু ইদানিং এক সর্বনেশে নতুন আদর-যত্ন শুরু হয়েছে, যাতে তৃপ্তি নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, আছে শুধু দাহ আর আতঙ্ক। এ আদর-যত্নে কি সম্মান আছে? পোষা কুকুর তো তাহলে খুব সম্মানীয়।

॥ ষোল ॥

প্রভাবতী একবার ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। দেখলেন ছেলের মুখ নীচু, ঘাড় হেঁট। বিনা ভূমিকায় বললেন—সাহস আছে?

হেমন্ত চকিতে চোখ তুলে তাকাল। প্রভাবতীই আবার কথা কইলেন—এই রাতে এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে পার? আছে সে সাহস?

—কোথায়? কোথায় যাব? অস্ফুট উচ্চারণ করে হেমন্ত।

প্রভাবতী চাপা দৃঢ়স্বরে বলেন—যেখানে হোক। রাস্তায়, গাছ-তলায়, খোলা মাঠে। শুধু নরকের বাইরে।

—এত রাত্রে!

—রাতই তো ভাল। দিনের বেলা চলে যাবার কী কৈফিয়ৎ দেব?

—এখন তো গেট বন্ধ।

—কাটানে কথা কয়ো না। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। পিছনের পাঁচিল ডিঙোতে পারবে না? একবস্ত্রে চলে যাব। এদের কিছু নিয়ে যাব না।

হেমন্ত একটু হাসির মত করে বলে—এদের অন্নে গড়া দেহগুলো?

প্রভাবতী এক মিনিট চুপ করে থাকেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকান। বলেন—হ্যাঁ, সেগুলো নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু সেইটুকু নিয়েই ঝাড়া হাত পা তিনটে মানুষ বেরিয়ে যাব, আর বাকী জীবন এই অন্নপাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

—পাঁচিল ডিঙোতে গিয়ে ধরা পড়লে কি হবে সেটা তো ভাবতে হবে!

প্রভাবতী গম্ভীর কটু গলায় বলেন—এত রকম ভাবনা যখন তোমার মনে এসে ভীড় করছে হেমন্ত, তোমার এখনও সময় হয় নি। কিন্তু আমি আর কোন কিছু ভাবতে পারছি না। আমাকেই তবে তুমি ছুটি দাও, আমি বসে বসে চোখের ওপর আমার সন্তানদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখতে পারব না। তোমাদের যা কপালে হোক।···হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন প্রভাবতী। ইষ্টদেবতাকে একটা প্রণাম করে আলনা থেকে সিল্কের চাদরখানা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

হেমন্তর সাহস হল না মাকে ধরে। সাহেবী হোটেলের খানা খাওয়া পোশাকে মাকে স্পর্শ করা চলে না। তাই সাবধানে ছোঁয়া বাঁচিয়ে সামনেটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলে—পাগলামী করে কি হবে মা! দিনের বেলা ভেবেচিন্তে যা হোক একটা ঠিক করে—

—না না না। প্রভাবতী চাপা চিৎকার করে উঠলেন—এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে চাই আমি এদের দেউড়ি পেরিয়ে। প্রভাবতী পা বাড়ালেন।

—রাত্তিরে দেউড়ির বাইরে বাঘা আর ভূতো ছাড়া থাকে মা! আর্তনাদ করে ওঠে হেমন্ত।…

প্রভাবতী থমকে দাঁড়ান। বাঘা আর ভূতো। নেকড়ের মত দুটো কুকুর। ভবানীশঙ্করের আদরের পোষ্য। গৃহরক্ষীও বটে। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বসে পড়লেন প্রভাবতী। দেয়ালে মাথা ঠুকলেন ঠাঁই ঠাঁই করে। কেঁদে উঠলেন—ওরে, আমার কি তাহলে মুক্তি নেই?

॥ সতেরো ॥

কিন্তু একা প্রভাবতী কেন, মুক্তির আশায় কাঁদছে এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট কাঠ। কাঁদছে প্রতিটি মানুষ। কেউ জেনে বুঝে কাঁদছে, কেউ কাঁদছে না বুঝে। যারা না বুঝে কাঁদছে, তাদের কান্নাগুলোই বিকৃত মূর্তি নিয়ে দেখা দিচ্ছে বিভীষিকার ছায়া ফেলে ফেলে।

আকণ্ঠ মদ খেয়ে জ্বলতে-জ্বলতে ভবানীশঙ্কর যখন নিজের শয়ন মন্দিরে এসে হাজির হয়, তখন প্রথম কাজ হয় তার একটা বেত নিয়ে আস্ফালন। বেতটা নাচিয়ে নাচিয়ে বলে—কি গো চারুহাসিনী, নিতান্ত বিরহিণীর মতন তো দেখাচ্ছে না? বলি এতক্ষণ ঘরে কে ছিল?

চারু ভারী শরীর নিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—গলায় দড়ি আমার! থাকবে আবার কে? ছিল গুচ্ছের দাসী বাঁদী।

—দালানের টেবিলে কাঁটা চামচ ডিস প্লেট ছড়ানো দেখলাম মনে হল! খেল কে? কোন্ ভাবের লোক?

চারুহাসিনী শিউরে বলে—ছি ছি ছি ছি! ঠাকুরপো খেয়ে

গেছে যে। কী অকথা কুকথা বল!

—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! মাতাল প্রলাপোক্তি করে—তাতেই সব বাঁচল? ঠাকুরপো বুঝি শুকদেব?

—আঃ থাম!

—থামব কেন, বলি থামব কেন? নিজের পরিবার অন্য লোকের সঙ্গে ভাব করবে, আর আমি থামব?

আবার বলে—বেতটা বয়ে বয়ে মরি চারুহাসিনী কোনদিন, কাজে লাগানো হয় না। এটা কি উচিত তোমার? সতীসাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর ইচ্ছাপূরণে 'সহায়' হয়। পিঠের কাপড়টা একটু তোল দিকি।

চারুহাসিনী জানে এ বাঘ নয়, রাস্তার নেড়ি কুকুর। মদের ঝোঁকে ঘেউ ঘেউ করছে মাত্র। তাই চাপা স্বরে বলে—তা হলে তোমার মান-মর্যেদা খুব বাড়বে তো? আমলা কর্মচারী চাকর দাসী সবাই যখন টের পাবে? দে চৌধুরীদের ছোট কর্তা মদ খেয়ে পরিবার ঠেঙাচ্ছে, মুখটা খুব উজ্জ্বল হবে তো?

—কী! কী বললে চারুহাসিনী? ছোটলোকদের এত বড় আস্পদ্দা হবে, ছোট মুখে বড় কথা কইবে? চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলব না?

চারুহাসিনী বলে—তুলবে তো কাল তুলো। আজ শোও।

—শোবো? বলি ওহে—চারুহাসিনী, মায়াজাল বিস্তার করতে চাইছ? কামিখ্যের মন্তর পড়ে ভেড়া বানাতে চাইছ ভবানীশঙ্কর দে চৌধুরীকে? ও আশা ছাড়ো। দে চৌধুরীরা কখনও পরিবারের আঁচল ধরে না।

চারুহাসিনী দুঃসাহসে ভর করে বলতো—কেন ধরবে না? তোমাদের নিজের বাপই তো শুনেছি পরিবারের—

ভবানীশঙ্কর সোফায় বসে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে জড়িত স্বরে বলে—হ্যাঁ, ওই একটা লোক ছিল বটে মহা স্ত্রৈণ। বাপ বলতে লজ্জা করে।

—তা তোমার দাদা তো বাপকে খুব ভক্তিছেদ্দা করেন।

—হুঁ! তা করে। এক গোয়ালের গরু যে। তারে বাড়া স্ত্রৈণ।

চারুহাসিনী মাতালের কাছে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। তার প্রায় মুদিত চোখের সামনেই ভ্রূভঙ্গী করে বলে—আবার এদিকে তো শুনতে পাই রোজ রোজ নতুন নতুন মাল আসছে।

—চোপরও! কে বলেছে? গৌরীশঙ্কর দে চৌধুরী নেশা করে, বাইজী পোষে, বেইমানী করে না।

কথার মোড় ঘুরে যায়।

চারুহাসিনী নিজের শ্বেতপাথরের থামের মত হাত ছুখানা দিয়ে লোকটাকে বেষ্টন করবার চেষ্টা করে অভিমানে গলে বলে—তা বেইমানীটা বুঝি শুধু দাদার ছোট ভাইয়ের একচেটে?

—ছোট ভাই? ছোট ভাইটা কে চারুহাসিনী?

—কে আবার? জান না কে? নিজে না?

—আমি? হো হো করে হেসে ওঠে ভবানীশঙ্কর—আমি হচ্ছি পুরুষসিংহ। মেয়েমানুষের নাকী কান্নায় আমার কিছু ইতরবিশেষ নেই। এই এখন যদি তোমায় আগাপাস্তলা চাবকাই, আমার কি মনে ছুঃখ হবে? হবে না। আমি হচ্ছি মাতুলক্রম। বুঝলে চারুহাসিনী! আমার মেজমামা পেটে লাথি মেরে মামীকে মেরেই ফেলল।

সুস্থ অবস্থায় এসব কথা বলে না ভবানীশঙ্কর, বলে মদের ঝোঁকে। চারুহাসিনীও তা বিলক্ষণ জানে। তাই ভবানীশঙ্করের ওই বে-এক্তার অবস্থাটা তার কৌতূহল নিবৃত্তির সহায়ক।

মাতালের জড়িয়ে আসা স্বরযন্ত্রকে সে তাই যেন ঠেলে ঠেলে সহজ সুরে আনতে চায়। বলে—ওসব হচ্ছে তুষ্টু লোকের রটনা। সত্যিই কি আর তাই ঘটেছিল?

—ঘটে নি মানে? আলবৎ ঘটেছিল—মাতাল রুখে ওঠে—নিজের চোক্ষে দেখলাম, আর বলে কি না—

—ওমা, তা তাঁর ফাঁসি হলো না?

—ফাঁসি। মাতাল হা হা করে হেসে উঠে বলে—টাকাওলা

লোকের খুনের অপরাধে ফাঁসি হবে? তুমি যে হাসির ধমকে আমার নেশা ছুটিয়ে দিলে চারুহাসিনী। ফাঁসি হবে গরীবগুরবো লোকের!

—বাঃ তাই বুঝি? এ মহারাণীর রাজ্য না?

—মহারাণী, মহারাণী! মহারাণী বানান কি চারুহাসিনী? হাসিনী না ফাঁসিনি! গলার ফাঁসি!

চারুহাসিনা বিরক্ত কণ্ঠে বলে—হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে খুব গপ্পো করা হয়েছে আমার। এই তো অদেষ্ট। আবার বলে কি না কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলি, কে এসে ঘরে বসেছিল! কী করব! উপায় নেই তাই এমনি করে পড়ে আছি। পেটের ছুটো না জন্মাতো তো—কোন্ কালে পরপুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যেতাম।

ভবানীশঙ্করের ঘাড় আরও গুঁজে আসে, তবু বলে—বিড়বিড় করে কি বলছিস রে, হারামজাদী?

—বলব আবার কি। আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি।

—অ-দৃষ্ট! ললাট! কপাল! দে চৌধুরীদের বাড়ির বৌ হয়ে কপাল খুঁড়ছিস? চাবুকটা কোথায় গেল? চাবুকটা? এগিয়ে নিয়ে আয়, এগিয়ে নিয়ে আয়।

চারুহাসিনী বলে—হয়েছে। নাও, এখন শুতে এসো।

মাতাল ছাড়া ছাড়া গলায় বলে—শুতে যাব? পরিবারের ঘরে? বললেই হল? পঞ্জিকা দেখানো হয়েছে?···ভট্‌চাযের মত নেওয়া হয়েছে?

কথা আরও জড়িয়ে যায়, গলা থেকে কেমন একরকম শব্দ ওঠে, একসময় সোফাতে বসেই ঘাড় গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিনও ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন বড় ঘড়িতে আড়াইটে বেজেছিল।

যখন গৌরীশঙ্কর এসে নিজের শোবার ঘরের দরজায় দুম দুম করে লাথি ঠুকছিলেন। নেশায় রঙিন চোখে নয়, সাদা চোখে। ঝনঝন করে উঠেছিল বাড়ি। যে যেখানে ছিল জেগে উঠে সভয়ে নিজের

নিজের এলাকা থেকে উঁকি মারছিল।

কাছে যেতে সাহস নেই কারুর। ভয়ে কাঁপছে সবাই, আর বুঝতে পারছে না মালতী এত নির্ভীক হল কি করে? এমন দুর্জয় মান নিয়ে বসে থাকবে মালতী যে, দরজা ভেঙে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তবু খিল খুলবে না!

কিন্তু বড় বেশি মজবুত দরজা। সহজে ভেঙে পড়ে না। শুধু খিলেনের মাথা থেকে কখানা চুন-বালির চাপড়া খসে পড়ে।

গৌরীশঙ্কর তবু দরজায় লাথি মেরে চলেছেন। ওঁকে নিবৃত্ত করে এমন সাহস কারুর নেই। বাড়িসুদ্ধু সবাই ভয়ে কাঁপছে। শেষ পর্যন্ত সাহস করে এগিয়ে এল হেমন্ত। বলল—বড়দা। বড়দা, শুনুন! কী ছেলেমানুষী করছেন! ঘরের মধ্যে বড় বৌরাণীর কোন বিপদ হয়েছে কিনা দেখুন। নইলে এ রকম করার মানুষ তো তিনি নন!

গৌরীশঙ্কর চমকে মুখ তুলে তাকান। এ ছোকরা বলে কি! বিপদ!

ঘরের মধ্যে কোন বিপদ ঘটেছে! মালতীর! কই, এ সম্ভাবনা তো মনে আসে নি! তবে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মালতী! নয়তো একেবারেই—

কেঁপে উঠলেন গৌরীশঙ্কর। এতক্ষণ এ কথা ভাবেন নি তিনি। তিনি শুধু ভাবছেন এ মালতীর তেজের জেদ। অভিমানের কাঠিন্য। পাতাল-ঘরের কাণ্ডকারখানার কথা যে কানে এসেছে মালতীর! তাই গোঁসা হয়েছে।

কিন্তু গোঁসা করে জেদ দেখিয়ে লোক হাসাবে মালতী? এ স্বভাব তো তার নয়। মাঝরাত্রে যখন একতলা থেকে চাকরেরা ধরাধরি করে তুলে দিয়ে যায় তাঁকে, দাসী দরজা খুলে ধরে, মালতী তাড়াতাড়ি বিছানা বালিশ ঠিক করে দেয়। আর তারপর—ঘরের দরজা বন্ধ হবার পর গৌরীশঙ্কর যখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন মালতী হাসে। বলে—নেশার ঘোরে ক্ষমা চাইতেও নেই, প্রতিজ্ঞা করতেও নেই। ও খালি বালিতে জল ঢালা।

গৌরীশঙ্কর মালতীর পায়ে ধরে মাপ চাইতে যান, বলেন—তুমি

কেন আমাকে আটকে রাখো না বৌরাণী ? কেন ভাসিয়ে দাও ? তুমি যদি আটকে রাখতে—

মালতী হেসে বলে—শোন কথা ! চোর না ডাকাত, যে আটকে রাখব ? আর পরিবারের আঁচল-ধরা পুরুষ কি ভাল ? আমার তো দু-চক্ষের বিষ !

গৌরীশঙ্কর বলেন—তোমার এমন চেহারা, এই বয়েস, তুমি এমনি করে সারা সন্ধ্যে বিরহে হাহাকার কর, আর আমি কি না নাচউলি নিয়ে—বৌরাণী, আমি মহাপাষণ্ড ! আমি মহাপাতকী ! সাতজন্ম নরক ভোগ করলেও আমার এ পাপের ক্ষয় হবে না।

কিন্তু মালতী তাতেও হাসতে ছাড়ে না। বলে—কে বললে তোমায়, আমি বিরহে হাহাকার করি ? তোমাদের নাচউলি আছে, আমাদের বুঝি ভাবের লোক থাকতে পারে না ? আমরা তার সঙ্গে রঙ্গরস করি, তাস-পাশা খেলি, পান খাই, গান শুনি।

গৌরাশঙ্কর বিশ্বাস করেন না। বলেন—তুমি কি তেমন মেয়ে বৌরাণী ?

মালতী বলে—আমি কেমন মেয়ে, তুমি তার কি জানো !

কিন্তু একশো আট বছর পরমায়ুর সাধনার কথা টের পেয়ে অবধি মালতী যেন বদলে গেছে। মালতী আর তেমন করে হাসছে না।

তা গৌরীশঙ্করও বদলেছেন বৈকি। রোজই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে গৌরীশঙ্করের। কোন কোন রাত্রে রাত গড়িয়ে শেষ প্রহরে ঠেকছে, কোন রাত্রে দোতলায় আর উঠছেনই না, একেবারে বৈঠকখানা বাড়ি থেকে ভোরবেলা টমটম জুততে আদেশ দিচ্ছেন গঙ্গাস্নান করতে যাবেন বলে।

গতকাল রাত্রে মালতী সেই কথা তুলে কথা বলেছিল। বলেছিল —পরমায়ুর সাধনা হচ্ছে না মরণের সাধনা হচ্ছে ? এভাবে অনিয়ম অত্যেচার করলে যে দিনে একশো আটদিন করে পরমায়ু কমে যাবে।

'একশো আট' কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর। কিন্তু সাহস করে আর সে নিয়ে আলোচনা করতে যান নি। বলেছিলেন—

কাল থেকে আর হবে না।

কবে যেন একদিন হঠাৎ মালতী বলেছিল—তোমার ঠিকেদারটা তান্ত্রিক ?

—কেন, ঠিকেদারের কথা কেন ? তার কথায় তোমার দরকার ? রুখে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর।

মালতী বলেছিল—কেন দরকার জানো ? আমি তোমার অগ্নি নারাণ সাক্ষীর বিয়ের পরিবার বলে। 'তান্ত্রিক' করে লোকটা তোমার মাথা বিগড়ে দিলে ক্ষেতি তো ওর হবে না, হবে আমার।

গৌরীশঙ্কর বলেছিলেন—না না, ওসব কিছু নয়। ধর্মপুণ্যির ধার ও ধারে না। তবে লোকটা একটু অন্য রকমের বটে।

—তুমি তো ওর কথায় উঠছ বসছ।

—ওঠা বসা আবার কি! লোকটার অসাধারণ বুদ্ধি তাই একটা আকর্ষণ পাই। এই যে বাড়ি তৈরি করছি, সব নক্সা ওর। এদিকে ওদিকে আরও তো বাড়ি হচ্ছে, আমাকে তাকিয়ে দেখতে হয় না। আর এ জগতে এই একটা মাত্র লোক দেখলাম বৌরাণী, পয়সাকে যে তৃণজ্ঞান করে।

—তবে তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যাবার এত শখ কেন ওর ? কী দরকার ছিল তোমার এই চোরা সিঁড়ি, পাতাল ঘরের ? যার থেকে পাপের পথ পরিষ্কার হচ্ছে। এসব তো ওর কারসাজি ?

—তা সত্যি বলতে বৌরাণী, সেটা ঠিক। এসব আমার মগজে খেলত না।

—আমার একবার লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

—কেন ? তাকে দেখে তোমার কি হবে ?

—এমনি। দেখব সামান্য একটা ঠিকেদার তোমার এত বন্ধু হল কি করে।

—দেখো বৌরাণী, লোকটা সামান্য হয়েও যেন সামান্য নয়। ওইটাই ইয়ে—

—আমারও তো তাই! কিন্তু এমনি তোমাদের পোড়া সমাজ,

বেটাছেলের ষোলশো গোপিনীতে দোষ নেই, মেয়েমানুষ কৌতূহলের বশে একটা পরপুরুষের সঙ্গে কথা বললে জাত গেল। তোমাদের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার।

গৌরীশঙ্কর হেসেছেন, বলেছেন—তোমাদের যে মোহিনী-মায়া। পুরুষ পতঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়। তাই পর্দার আড়ালে রাখা।

—একদিন পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ব। বলে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল মালতী।

এই মালতীর স্বভাব। তেজ করে ঘরে খিল দিয়ে থেকে বরকে ঢুকতে না দিয়ে লোক জানাজানি করবার মেয়ে সে নয়। হেমন্তও সেই কথাই বলল।

গৌরীশঙ্কর কিন্তু ভুরু কোঁচকালেন। বিপদের আশঙ্কাটা মনে রেখেও বললেন—বৌরাণী কেমন লোক তা তুমি কেমন করে জানলে হে? তুমি কেমন করে জানলে?

—বড়দা, আমি হেমন্ত। আপনাদের ছোট ভাই।

—ছোট ভাই! ছোট ভাই! ছোট ভাই তো ভাইয়ের মত কাজ করো! দরজা খুলে দেখবার ব্যবস্থা করো, কি হল ভিতরে।

এতক্ষণে কাহিল হয়ে বসে পড়লেন গৌরীশঙ্কর দালানে পাতা কেদারায়। কী বিঘ্ন! আজকেই মনটা বড বিগড়ে গিয়েছিল, তাই সান্ত্বনার আশায় ছুটে আসছিলেন ঘরের আশ্রয়ে। কিন্তু আজই এই বিপর্যয়।

আজ গৌরীশঙ্কর খুন করতে করতে রয়ে এসেছেন। লোকটা হঠাৎ কেমন পালিয়ে গেল তাই, নইলে আজ মুখুজ্যেটা, ওই ইতর জীবটা, গৌরীশঙ্করের দু-হাতের বজ্র নিষ্পেষণেই শেষ হয়ে যেত।

গলাটা টিপে ধরেছিলেন গৌরীশঙ্কর। হঠাৎ ঝটকান দিয়ে পিছলে পালিয়ে গেল লোকটা। পালাবার সময় লোকটাকে নর্দমার ইঁদুরের মত মনে হল গৌরীশঙ্করের। কী ইতর! কী নোংরা! কী লোভী! কী নীচ! চন্দননগর থেকে যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল—

॥ আঠারো ॥

কিন্তু চন্দননগর না হাতী। নিয়ে এসেছিল চেৎলা না কালীঘাটের ওই দিক থেকে। রূপও নেই বয়েসও নেই, রোগা হাড়গিলে একটা বয়েসওলা মেয়ে। ঠিকেদারকে বুঝিয়েছিল মুখুজ্যে—দেখছ বটে থান কাপড়ে মোড়া একটা হাড়ের বোঝা। হবেই তো, বড্ড গরীব কিনা। তা ভাই পূর্ণিমার দেরী আছে, এ কদিন ভাল খেতে মাখতে পেলে গায়ে সেরে উঠবে। ওই জন্যেই তো চন্দননগর থেকে আনিয়ে নিয়ে চেৎলায় ওর মাসীর বাড়ি রেখেছি। সুবিধে আছে, নিজে থেকেই আসবে, জোর ফলাতে হবে না।

তা সত্যিই জোর করতে হয় নি। হৃষ্টচিত্তে পালকিতে উঠেছিল লক্ষ্মণদাসের বৌ যমুনা। লক্ষ্মণদাস বৌকে আশ্বাস দিয়েছিল—একটা দিনের জন্যে বিধবা সাজবি, তাতে হয়েছে কি? তাতে তো আর আমার প্রেমাই কমে যাচ্ছে না। ঠাকুরমশাই আমাদের মস্ত হিতৈষী, তাই এ সংবাদ এনে দিয়েছেন। 'যখের ধন' তো সোজা ঐশ্বয্যি নয়। মেয়েছেলে ভিন্ন হবে না তাই তোকে কষ্ট দেওয়া। নইলে কি আর—আরে তা নইলে ঠাকুরমশাই নিজেই তো নিতে পারতো। আমাদের ভালবাসে বলেই না আমাদের কাছে একথা ফাঁস করেছে।

তা সেই যখের ধনের আশায় আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে যমুনা পূর্ণিমার রাত্রে পালকি চড়ে বসল। সঙ্গে আলাদা পালকিতে মুখুজ্যে আর অন্য একটা লোক। না, ঠিকেদারবাবুকে যমুনা চেনে না। চেনে মুখুজ্যেকে। অনেক দিনের চেনা।

মুখুজ্যে তাদের সংবাদ দিয়েছে কোন্ একটা বাড়ির নীচে পাতাল ঘরে পোঁতা যখের ধনের সন্ধান পাওয়া গেছে, শুধু তুলে আনার ওয়াস্তা।

তবে একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে। পূর্ণিমার রাত হওয়া চাই, আর রাত্তির দুপুর হওয়া চাই। আর চাই খালি হাত থান পরা

স্ত্রীলোক। পুকুরধারে বাগান, সেই বাগানের এক ঝোপের আড়ালে নেমে গেছে সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই মস্ত ঘর, আর সে ঘরে ঘড়া ঘড়া টাকা। ওইরকম সাজের স্ত্রীলোককে কিছু বলবে না যখ, কিন্তু পুরুষ বা সধবা কোন স্ত্রীলোক ঢুকলেই ব্যস। ক্ষেপে যাবে।

কোন ভয় নেই, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে মুখুজ্যে, যমুনা ঘড়াটা টেনে নিয়ে উঠে চলে আসবে।

মুখুজ্যেকে টাকার ভাগ দেবার দরকার নেই। যখের টাকা বামুনের পেটে সয় না। নেবার হলে তো মুখুজ্যে নিজেই—

কিন্তু এরকম সব গল্প বানানো ছাড়া আর উপায় কোথা মুখুজ্যের। আর জোটাবে কোথা থেকে? এক কুড়ি কমবয়সী বামুনের বিধবা কি গাছের ফল? অথচ এক রাশ টাকা দাদন নিয়ে বসে আছে সে।

ধর্মে খাঁটি আছে মুখুজ্যে। ভেবে রেখেছে, যতই হোক, ওরা হল চেৎলার বস্তির ছোটলোক, ওদের আর এতটুকুতে জাত যায় না। বরং রাজা-রাজড়ার ছোঁয়ায় সগ্‌গে যাবে। আর টাকার ঘড়া? তা ঘড়া না পাক, তোড়া তো পাবেই। তারপর ঘরের বৌ ঘরে যাবে।

গৌরীশঙ্কর দু-চার বারের পরই বলেছেন কিনা—ও তোমার রাত পোহালেই সব ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো মুখুজ্যে। রাখব কোথায়? এক তোড়া করে টাকা, আর একখানা করে পালকি। ব্যস। চড়িয়ে যেখানে যেতে চায় সেখানে পার করে দিয়ে আসবে।

অতএব মুখুজ্যে নিশ্চিন্ত। জানে লক্ষ্মণদাসের কাছে ফাঁস হবে না কিছু। যমুনা নির্ঘাৎ কিল খেয়ে কিল চুরি করবে। যমুনার মত মেয়েমানুষ কখনও স্বামীর কাছে নিজের ইজ্জত নষ্টর কথা বলে ফেলবে না। যমুনা ভীতু। লক্ষ্মণ হুঁদে। টাকার তোড়া নিয়ে গিয়ে বলবে ঘড়ার কথাটা ভুল, আসলে তোড়া।

কিন্তু এসব কথা গৌরীশঙ্করের সন্দেহের অগোচরে। মুখুজ্যে যে একটা এয়োস্ত্রী জেলে মাগীকে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা সাজিয়ে ঠকাবে

তাঁকে, এ তার শুধু সন্দেহ কেন, স্বপ্নেরও অগোচর।

তাই যমুনা যখন সেই রাত্রে পাতাল ঘরে গৌরীশঙ্করকে যখ ভেবে 'ও বাবা যখ, দয়া করো, কেরপা করো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর। অথচ যমুনা এই পাতাল ঘরে এমন একখানি দিব্যকান্তি পুরুষ দেখে প্রেতাত্মা ছাড়া মানুষ ভাবে নি। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল তার।

'দয়া কর দয়া কর', সবাই বলে কিন্তু এ এমন 'যখ যখ' করছে কেন? ভেবেছিলেন গৌরীশঙ্কর। তারপর বাতি ধরে ওর আপাদমস্তক দেখে গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন—নাম কি তোমার?

—ও বাবা যখ, আমার কোন দোষ নেই, ওই মুখুজ্যে মুখপোড়া আমায় সন্ধান দেছল। আমার টাকার ঘড়ায় দরকার নেই বাবা, মেরো-কেটো না।

—আবোল-তাবোল কথা রাখো। নাম কি বলো?

—আজ্ঞে বাবা যমুনা দাসী।

মুহূর্তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা দুরন্ত ক্রোধের বিদ্যুৎ চড়াৎ করে উঠেছিল গৌরীশঙ্করের। সেই মুহূর্তে গিয়ে মুখুজ্যের গলা টিপে ধরবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে, ফের প্রশ্ন করেছিলেন—বাড়ি কোথায়?

—চেতলায় বাবা! চেতলার বস্তিতে।

ঠক ঠক করে কাঁপছিল যমুনা। প্রাণ নিয়ে কি ফিরতে পারবে? এই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাতে পারবে লক্ষ্মণকে?

গৌরীশঙ্করের যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে, তবু প্রশ্ন করেছিলেন—বাড়িতে আছে কে?

—আজ্ঞে বাবা সোয়ামী আর দুটো খোকা।

—সোয়ামী! হা হা করে হেসে উঠলেন গৌরীশঙ্কর—সোয়ামী আছে তোর?

—আছে বাবা।

—তবে থান পরেছিস যে?

—আপনি তো সবই জানো বাবা। সব্বজ্ঞ আপনি। মুখুজ্যে ঠাকুর আমায় বলে দিয়েছিল—বেধবার সাজ না সাজলে কায্য সিদ্ধি হবে না।

গৌরীশঙ্কর সকৌতুকে বলেছিলেন—কার্যটা কি তা জানিস?

—'যখের ধন' থেকে টাকার ঘড়া নেবার কথা বলেছিল বাবা। আমি তার একটা কানাকড়িও ছুঁতে চাই না বাবা, আমাকে প্রাণে মেরো না।

গৌরীশঙ্কর বলেছিলেন—নাঃ, তোকে আর প্রাণে মারবো কি! ছুঁচো মেরে হাত নষ্ট। যাঃ পালা। ও, তুই টাকার লোভে বাঘের গর্তয় এসেছিলি না? আচ্ছা এই নিয়ে যা।...টাকার একটা তোড়া ছুঁড়ে দিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর।

পড়ি তো মরি করে ছুটেছিল যমুনা সিঁড়ি লক্ষ্য করে। অবশ্য সেটা কুড়িয়ে নিয়ে।

॥ উনিশ ॥

—ইষ্টনাম স্মরণ কর মুখুজ্যে! গলায় তুই হাতের দশটা আঙুলের চাপ দিয়ে বলে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর—আর সময় পাবে না।

আঁ আঁ করে উঠেছিল মুখুজ্যে। আঁ আঁ করতে করতেই বলেছিল—কী অপরাধ দেখলেন বাবু?

—চুপরও হারামজাদা! তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালেও রাগ যায় না। বল্ পাজী, সব কটাই এরকম নিকষ কুলিনের মেয়ে কি না?

—আঁ আঁ, বাবু, না, না। মারবেন না। সব ভাল বামুনের মেয়ে। এ ছুঁড়ি আপনাকে ঠকিয়েছে। হাত ছাড়িয়ে পালাবার জন্তে বলেছে জেলের ঘরের। ছুঁড়ি ইচ্ছে করে এসে শেষকালে ভয় খেয়েছে।

—চুপ চুপ! মিথ্যেবাদী চামার। বামুন বলে রেয়াৎ করব না

মুখুজ্যে, ব্রহ্মহত্যার পাতক মাথা পেতে নেব। স্মরণ কর্ তোর ইষ্টকে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ কেমন করে যেন হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়েছিল মুখুজ্যে, আর ছুট দিয়েছিল সাপ-খোপ কাঁটা-ঝোপ কিছু না মেনে।

—ঠিকেদারটা কোথায় গেল। ঠিকেদারটা? উন্মত্ত ক্রোধে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর। বলেছিলেন—খুন করব, ওটাকেও খুন করব। পাপের জড় রাখব না। ওই আমাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু কোথায় সেই অজ্ঞাতপরিচয় বিদেশী? তাকে আর দেখা যায় নি। সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

গৌরীশঙ্কর বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একটি স্নেহ-সরস আশ্রয় দেবার মানসে এগিয়ে গিয়েছিলেন অন্দরের দিকে, নিজের শোবার ঘরের দরজায়। সে দরজা খোলাতে পারলেন না।

বসে পড়ে বললেন—তবে খোলার ব্যবস্থা কর।

শাবল এল, দরজায় চাপ পড়ল, মড় মড় শব্দে খুলে পড়ল দরজা।

গৌরীশঙ্করের মেজাজের ভয় তুচ্ছ করে হুড়মুড়িয়ে অনেকগুলো মাথা উঁকি মারল সেই ঘরে। দেখবে কী অবস্থায় রয়েছে মালতী। অজ্ঞান হয়ে গেছে? মরে গেছে? না কি কোন অসুবিধেকর অবস্থায় পড়ে—

কিন্তু কই? কোথায় মালতী? শূন্য ঘর, শূন্য বিছানা!

—পাখি উড়ে গেছে! চুপি চুপি চাপা হেসে বলেছিল চারুহাসিনী।

কিন্তু উড়ে যে যাবে, তার জন্যে তো খাঁচার দরজা খোলা চাই? বন্ধ দরজার মধ্যে থেকে উড়ল কি করে? পিছন দিকে? বাগানের দিকে?

সেদিকে তো জাফরি আর বারান্দা। ওই দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে কেউ? অন্ততঃ মালতী পারে না নিশ্চয়।

ঘরের মেঝেয় মালতীর পায়ের একটা চুটকি পড়ে। খাটের বাজুতে ঝুলছে মালতী সন্ধ্যায় যে নতুন জামদানী শাড়িখানা পরেছিল, সেই শাড়িটা। তবে? এ তো ইচ্ছাকৃত অন্তর্ধান।

কিন্তু সেটা সংঘটিত হল কোন্ পথে? শেষ কে দেখেছিল মালতীকে?

আর কে! তার খাস দাসী টগর। কোথায় টগর? নেই। টগরও নেই। তার মানে গিন্নীতে আর চাকরাণীতে ষড়যন্ত্র করে হাওয়া হয়েছেন।

তবে এখন খোঁজ আরও কে হাওয়া হয়েছেন।

হেমন্ত? হেমন্ত তো সামনেই দাঁড়িয়ে। আশ্রিত, অভ্যাগত, গুরু পুরুত, চাকর নফর সবাই আছে। হারায় নি কেউ। মালতী কি তবে তার খাস দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরে ডুবতে গেছে?

চারুহাসিনী টিটকিরি দিয়ে বলে—পুকুরে কেন, সাগরে। প্রেম-সাগরে। আদিখ্যেতা! মেয়েমানুষ হারিয়ে গেলে আবার এমনি করে খুঁজতে হয় তা জানি না।

সত্যি, কে না জানে মেয়েমানুষ হারানোর একটাই মানে। নন্দর বৌ বলে—যা বলেছ ছোট বৌরাণী। লোক জানাজানি করে খোঁজাখুঁজি। ছিঃ।

আর প্রভাবতী নিজের ঘরে বসে ইষ্ট দেবতাকে বলেন—মঙ্গলময়, তুমি মৃত্যুর মধ্যে থেকে জীবন দাও, ধ্বংসের মধ্যে থেকে রক্ষা কর। আমরা অবোধ, আমরা বুঝি না। এই রাত্রে যদি আমি হেমন্তকে নিয়ে পালাতাম! কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হতো তাহলে—

॥ কুড়ি ॥

আস্তে আস্তে পা ফেলছে মালতী, অন্ধকার সিঁড়ির ধাপে ধাপে। এ সিঁড়িতে একদিন খানিকটা নেমেছিল দিনের বেলায়। গৌরীশঙ্কর

শখ করে নামিয়েছিলেন। বলেছিলেন—দেখেছ কৌশল, এই সিঁড়ি, বরাবর চলে গেছে পাতাল ঘর অবধি। সেই মুখে একটা দরজা, আর এই দেওয়াল-আলমারির মধ্যে একটা দরজা? কুলুঙ্গির মধ্যে দিয়ে যে কাঠের তক্তা ঠেলে দিতে হয়, সেটা মাঝখানে একটা আটক। হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে যাতে নীচে থেকে ওপরে, কি ওপর থেকে নীচে চলাচল করতে না পারে।

মালতী খানিকটা নেমেছিল। সবটা নামে নি। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে এসেছিল তার। বাতাস নেই ভেতরে। গৌরীশঙ্করকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—চলো চলো, উঠে চলো।

—কি হল? হেসেছিলেন গৌরীশঙ্কর।—সবটা যাবে না?

—নাঃ।

—কেন? ভয় করছে নাকি?

—হ্যাঁ, ভয় করছে।

ততক্ষণে উঠে এসেছে দুজনেই। গৌরীশঙ্কর হেসে বলেছিলেন—কচি খুকি! ভয়টা কিসের করল? নতুন বাড়ি নতুন দেয়াল, ভূত আছে নাকি?

—ভূতের ভয় নয়, অন্য ভয়।

ততক্ষণে বাইরের আলো বাতাসে মালতীর মুখে হাসি ফুটেছে।

—অন্য ভয়টা কিসের শুনি?

মালতী স্বামীর গায়ে গা এলিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিল—কি জানি, কার মনে কি আছে! কি জানি কী মতলবে পাতাল ঘর বানিয়েছ, আর কী মতলবে আমাকে সেখানে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছ!

গৌরীশঙ্কর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন—কার মনে কি আছে! আমার মনে কি আছে, জান না তুমি?

—বাঃ, কি করে জানব বল? মনের মধ্যেটা কি দেখা যায়?

—যায় না?

—উঁহু। তুমি দেখতে পাও আমার মনের মধ্যেটা?

—পাই বৈকি।

—ছাই পাও। মালতী হেসে বলেছিল—আমি যে রাতদিন তোমার খাঁচার শিকলি কেটে পালাবার চিন্তা করি, সেকথা টের পাও?

গৌরীশঙ্কর স্ত্রীকে আদরে ডুবিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—সত্যি করে সে চিন্তা করলে, টের পেতাম।

এখন কি গৌরীশঙ্কর সেদিনের সেই কথাটা ভাবছেন? ভাবছেন 'নারী ছলনাময়ী' একথা কি তবে সত্যিই এত মর্মান্তিক সত্য?

গৌরীশঙ্কর কি ভাবছেন কে জানে। কিন্তু সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে মালতী সেদিনের কথাই ভাবছিল, সেদিন মিথ্যে ভয় খেয়ে শেষ অবধি না দেখে পালিয়ে আসাটা বোকামি হয়েছিল। জানা থাকলেই নির্ভয় হওয়া যেত।

মালতী কি আজ বড় বেশী অসম সাহসিক কাজ করছে? নেমে গিয়ে বিপদে পড়বে? সুরামত্ত গৌরীশঙ্কর সহসা নিজের কুকীর্তির প্রমাণ সমেত মালতীর সামনে ধরা পড়ে গেলে কি মেজাজের ঠিক রাখতে পারবেন?

কিন্তু মালতী তো গৌরীশঙ্করের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে চায় সেই শয়তানটার মুখোমুখি। যে তার কী এক পৈশাচিক উল্লাস সাধন করতে গৌরীশঙ্করকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, নারকীয়তার পথে ঠেলে দিচ্ছে। ওর কি গৌরীশঙ্করের উপরই শত্রুতা? না, ব্রহ্মণ্যধর্মের উপর শত্রুতা? এমন ক্রূর চক্রান্ত সৃষ্টি করেছে ও কিসের জন্যে? লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই কথাই জিজ্ঞেস করবে মালতী। টগর বলছে মুসলমান নয়, কিন্তু মালতীর বিশ্বাস, তাই-ই। কোন্ জাত-হারানো হিন্দু নাকি 'কালাপাহাড়' হয়েছিল, এও কি তেমনি? ভগবান, বুদ্ধিভ্রংশ গৌরীশঙ্করকে বুদ্ধি ফিরিয়ে দাও! ব্রাহ্মণের বিধবার অভিশাপে যে ছারখার হয়ে যাবে ও!

টগরের হাতের মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে।

মালতী চাপা উৎকণ্ঠায় বলে ওঠে—হাত কাঁপাচ্ছিস কেন টগর? আলো পাচ্ছি না যে!

টগর ফিসফিসিয়ে বলে—হাত কাঁপাব কেন? বাতাসে কাঁপছে।

—এখানে বাতাস কোথা? দম বন্ধ হয়ে আসছে। উঃ! নীচে নামলে হাওয়া আছে?

—উই পাতাল ঘরের সামনের চাতালটুকুতে আছে। বাগান দিয়ে নেমে এসে যেখানে ঘরের দরজায় পড়ে। ওইখানেই তো ঠিকেদার পাহারা দেয়।

—হাতে অস্তর থাকে?

—কই দেখি না তো। শুধু বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে পিঁজরের বাঘের মতন ফুঁসে বেড়াতেই দেখি।

—তুই কখন এত দেখিস?

—কেন, এই রাত দুপুরে। রান্নাবাড়ির পাশের চোরকুঠুরি দিয়ে নেমে।...আস্তে সাবধানে পা ফেলুন বৌরাণী আর ক'টা সিঁড়ি নামলেই—

ফস্ করে বাতিটা নিভে গেল।

—টগর! আর্তনাদ করে উঠল মালতী।

কিন্তু টগরের গলার সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু দ্রুত একটা পদধ্বনি যেন সিঁড়ির উপর ধাপে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ওটা বোধহয় মনের ভ্রম। তাই ভাবল মালতী। রুদ্ধশ্বাস বক্ষে বলে উঠল—টগর! দেয়ালের গহ্বরে প্রতিধ্বনি উঠল। কাঁপা বুকটা সামলে নিল মালতী, ওঃ, টগর বোধহয় ছুটে বাতিটা আবার জ্বেলে আনতে গেছে। আশ্চর্য! মালতী এত ভীতু! অপেক্ষা করতে লাগল মালতী দেয়ালে হেলান দিয়ে।

কিন্তু কতক্ষণ? কতক্ষণ সময় লাগে বাতি জ্বেলে আনতে? অনন্তকাল?

—টগর! টগর! আলো জ্বালতে গিয়ে মরে গেলি নাকি পোড়ারমুখী!

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। আর নীচে না নেমে দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে উঠে এল মালতী। কিন্তু সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এমন নীরন্ধ্র

অন্ধকার কেন? ঘরে তো ঝাড়ের বাতি জ্বলছে।....জগতের সব বাতিই কি ষড়যন্ত্র করে হঠাৎ নিভে গেল? লক্ষ্মীছাড়ি কোনও সাড়াই বা দিচ্ছে না কেন? মজা দেখছে? উঠে গিয়ে আগে টগরকে খুন করে তবে আর কাজ মালতীর।

রাগে দিশেহারা হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসে মালতী। কিন্তু এমন দিশেহারাই হতে হয় যে, কোথাও আর দরজা খুঁজে পায় না! দু হাতে ধাক্কা দিতে গিয়ে শুধু আড় করে আটকানো একটা তক্তার গায়ে হাত ঠোকে।

—টগর! টগর! লক্ষ্মীছাড়ি হারামজাদী, ইয়ার্কি করবার আর সময় পেলি না?....ওরে টগর....তোর মনে এই ছিল? আমায় একলা বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে ভয় খেয়ে পালালি?....টগর! তোর হাতে ধরি, দোর খুলে দে। আমার গলার পাটিহারটা তোকে দেব।

অজ্ঞাতসারে গলায় একবার হাত দিল মালতী। কই, পাটিহারটা কোথায়! পাটিহার....বিছেহার....কড়িহার....কোথাও কিছু নেই। পালঙ্কের উপর বিছানো আছে সে-সব। শুধু শাঁখাপরা হাতখানা তুলে কপালে করাঘাত করে মালতী মনে মনে বলল—টগর, তোর বুদ্ধির কাছে আমার হার হল। কিন্তু টগর যদি মালতীর সঙ্গে এমন করতে পারে, পৃথিবীতে তবে আর—বিশ্বাস কোথায়?

আবার দেয়াল ধরে ধরে পা পেতে পেতে নামতে লাগল নীচের দিকে। ভয়? তা ভয় করছে বৈকি। কিন্তু মাঝখানে যে নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়াবহতা। একটি একটি ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ির নীচের দিকের মুখের দরজাটা খুলে ফেলল মালতী।

॥ একুশ ॥

কুলুঙ্গীর ভিতর হাত চালিয়ে তক্তাখানা টেনে সরিয়ে দিয়ে টগর একবার টান হয়ে দাঁড়িয়ে বড় করে নিশ্বাস নিল। তারপর কাঁপা কাঁপা

হাতে দেয়াল-আলমারির দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে মুহূর্ত কয়েক ভেবে, চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে। হয়তো বাগানে, হয়তো বা বাগান টপকে পুকুরে।···বাগানের দিকের বারান্দায় ঝুঁকে একবার দেখে নিল। নীচেটা জনমানব শূন্য। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না একটা অলৌকিক মায়া বিস্তার করেছে। এদিকে এসে দেখল ঘরের ভিতর দিকের দরজা ভিতর থেকে যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ। মনে মনে বলল—ঠিকেদার মিনসের হাতে পড়ে বৌরাণীর কী খোয়ার হবে, ভগবান জানেন। আবার ভাবল ওর সোয়ামীর হাতে কত মেয়েছেলের কত খোয়ার হচ্ছে।····ভগবান উল্টো কাঠায় শোধ করেন। আলমারির বন্ধ দরজাটায় কান পাতল···তিন হাত পুরু দেয়ালের আবরণ ভেদ করে চাপা একটা আর্তনাদের শব্দ উঠে আসছে।

আমার মহাপাপ হল! আর একবার ভাবল টগর। তারপর মনকে প্রবোধ দিল, নতুন আর কি! এ সংসারে দাসত্ব করতে এসে পর্যন্ত পাপ তো কম করছি না। বড় বৌয়ের অন্নে পেট ভরিয়ে ছোট বৌয়ের কাছে গিয়ে বড় বৌয়ের কুচ্ছো গাইছি, ছোট বৌয়ের কাছে ঘুষ নিয়ে বড় বৌয়ের কাছে এসে ছোটর ব্যাখ্যানা করছি। নীচের তলায় যারা আশ্রিত অখচ্ছে, তাদের কাছ থেকেও টাকাটা সিকেটা নিয়ে প্রেমপত্তর চালাচালি করছি, খিড়কির দরজা খুলে দিয়ে তাদের ভালবাসার মানুষকে এনে ঘরে পুরে দিচ্ছি···পাপের আর বাকীটা রাখছি কি! এদের অন্নে দেহধারণই তো একটা মহাপাপ। ভাবল, এইবার কিছু টাকা দান-ধ্যান করে, গেরামে গিয়ে একেবারে ভালমানুষ হয়ে কাটিয়ে দেব বাকী জীবনটা। না, খেটে খেতে আর হবে না। ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটল। ঝাড়ের আলো পড়ে পালঙ্কে বিছানো গহনাগুলো যেমন ঝিলিক মারছিল, তেমনি আলোর ঝিলিক খেলল টগরের চোখে।

টগর গ্রামের মেয়ে। গাছে চড়তে ভয় খায় না। বারান্দায় এসে পড়া চাঁপা গাছটার ডালটা একবার বাগিয়ে ধরতে পারলেই হল।

বাঘা ? ভুতো ? ওরা টগরের অনুরাগী ভক্ত। ওদের কাছে টগরের ভয় নেই।

কিন্তু ভয় কি সত্যিই ছিল না ? না, সেইদিনই শুধু বাঘা আর ভুতো অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ? চেনা মানুষ চিনতে পারে নি ?

ঈশ্বর জানেন, কি ঘটেছিল সেদিনকার সেই রাত্রে।

শুধু গাছের পাখীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল গাছের শাখা নড়ে ওঠার ধাক্কায়। শুধু গাছতলার মাটিটা খানিকটা বসে গিয়েছিল একটা ভারী জিনিস পড়ার চাপে।

তারপর ?

পরের খবরটা বোধ করি জানে একমাত্র বাঘা আর ভুতো। কিন্তু তারা কি কথা বলবে ?

কথা বলবার অধিকারী শুধু মানুষ।

তাই না মানুষের এত অহঙ্কার !

তাই না সে পাখীর কণ্ঠস্বরও চুরি করে, বাঘের কণ্ঠস্বরও আয়ত্ত করে !

॥ বাইশ ॥

যমুনার জাতের খবর ঠিকেদার জানত না। ও শুধু দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি করে খাঁচার বাঘের মত পায়চারি করছিল।

কান পেতে আছে সেই আর্তনাদটির আশায়। যখন একটা অসহায় নারীকণ্ঠ চীৎকার করবে, কাতর মিনতিতে ভেঙে পড়বে, আর ঠিকেদারের কুটিল বীভৎস রাক্ষুসে চক্রান্তের বলি গৌরীশঙ্কর নেশায় টলমল করতে করতে তাদের প্রবোধ দেবেন কাল সকালেই ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে।

হঠাৎ পিছন দিকে একটা নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেল

ঠিকেদার।

একটা তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠ যেন কাকে নাম ধরে ধরে ডাকছে।

এ চীৎকার কোথা থেকে আসছে? এ তো পাতাল ঘরের মধ্যে থেকে নয়! গৌরীশঙ্করের দোতলার ঘর থেকে যে সিঁড়ি নেমে আসছে, এ শব্দ যেন সেই সিঁড়ির মধ্যে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!

সিঁড়ির মুখের দরজার শিকলটা খুলে ফেলল ঠিকেদার।

দেখল ভিতর থেকে বন্ধ।

সেই বন্ধ দরজায় কান পাতল।

কিন্তু সেই বারেবারে একটা তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যাকুল ডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। কোন্ নাম ধরে ডাক দিচ্ছে ওই ব্যাকুল কণ্ঠ?

রতন?

কমল?

অভয়?

গৌরীশঙ্করের অন্তঃপুরে এসব নাম আছে?

ঠিকেদার জানে না, গৌরীশঙ্করের অন্দরে কে আছে না আছে। জানবার তার দরকারও নেই। সে যে পৈশাচিক ব্রত গ্রহণ করেছে, সেই ব্রত উদ্‌যাপন হলেই চলে যাবে সে এখান থেকে। এই অঞ্চল থেকেই। গৌরীশঙ্কর নিমিত্তমাত্র, গৌরীশঙ্কর তার ব্রত উদ্‌যাপনের উপকরণ। তান্ত্রিকের সুরাপানের মড়ার মাথার খুলি।

গৌরীশঙ্কর তার ফাঁদে পা দিয়েছে।

গৌরীশঙ্করকে সে ঘৃণা করে না, করুণা করে। যে লোকটা একশো আট বছর পরমায়ু হবার সাধনা করে, তার চাইতে কৃপার পাত্র জগতে আর কে আছে?

ডাকটা যেন আর শোনা যাচ্ছে না।

সিঁড়ির দেয়ালে কি কেউ ধাক্কা দিচ্ছে?

ওই চোরা সিঁড়ির গুপ্তকক্ষে নতুন কোন পাপচক্র চলছে?

দরজাটায় ধাক্কা না দিয়ে নিঃশব্দে প্রবল চাপ দিল ঠিকেদার।

কিন্তু একচুল নড়ল না সে দরজা।

এ তার নিজের তদারকে করা লোহাকাঠের মজবুত দরজা। শাবল না পড়লে এর কিছু হবে না।

ওখানে কি হচ্ছে তা আমার জানবার দরকার কি?

ভাবল ঠিকেদার।

কিন্তু সরে যেতে পারল না। দরজার কপাটে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গৌরীশঙ্কর এক্ষুনি ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। ঠিকেদারের সেই পরম প্রতীক্ষিত আর্তনাদটির আগে তো নয়ই। ততক্ষণ সে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংহত করে কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়র শক্তি বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

আবার পায়ের শব্দ হচ্ছে না?

দরজার খিল মড়াৎ করে উঠল না?

হ্যাঁ, খিল খুলে পড়ল। কে যেন সেই খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কে! বাঘের গর্জন কি কখনও শুনেছে মালতী? শোনে নি। শোনবার কথাও নয়। শুধু কল্পনা। কল্পনার সেই বাঘের গর্জন বুকে হাতুড়ি বসিয়ে দিল মালতীর। এখানে যে বাতাস আছে অনুভব হল না।

সামনের লোকটা আর একবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল—কে?

ভয়ঙ্কর ভয়ের সময় বোধ হয় হঠাৎ সাহস আসে। বেপরোয়া সাহস। মালতী সেইখানেই সেই আবছা আলোয় বীভৎস দেখানো জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিই ঠিকেদার?

—তোমার সে কথায় কাজ কি? তুমি কে?

—'আপনি' বল আমায়! তীব্রস্বরে উচ্চারণ করল মালতী।

ও পক্ষ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল এই তীক্ষ্ণ স্বরে। মালতী বলল—তুমি আমার স্বামীর এমন সর্বনাশ করছ কেন? কী তোমার মতলব?

—স্বামী! তোম—আপনার স্বামী! কে আপনার স্বামী? রাজাবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি এভাবে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ করে, তাঁর তোমার দু-জনের

পাপের ভরা পূর্ণ করে তুলছ কেন? তোমার এতে লাভ কি?

—লাভ? আম্মার এতে লাভ? হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠে লোকটা বিকৃত বিকট একটা শব্দে।

মালতী কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? সারা শরীরে কোনও জোর পাচ্ছে না কেন? তবু না থাকা জোরকেই জোর করে টেনে আনে মালতী। তীব্রস্বরে বলে—হাসি থামাও। কথার জবাব দাও। কে তুমি? কোন দেশ থেকে এসেছ? আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার কিসের শত্রুতা?

কিন্তু উত্তরটা আর কানে এল না মালতীর। হঠাৎ অন্য কোন দেয়ালের পাশ থেকে আর একটা হা-হা হাসির আওয়াজ কানে এল। এ হাসি কার? গৌরীশঙ্করের না? কোথা থেকে এমন করে হেসে উঠলেন গৌরীশঙ্কর? তবে কি মালতীকে কোনখান থেকে দেখতে পেয়েছেন? আর অভিসারিকা কলঙ্কিনী ভেবে অমন ব্যঙ্গ হাসি হেসে উঠেছেন।

মালতী দু-পা পিছিয়ে সিঁড়ির ধাপে উঠে পড়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। দেখল চাতালের ওধারে সামনের দিকে একটা দরজা একটু দ্বিধাবিভক্ত হল, একটা আলোর রেখা ছুরির মত এসে পড়ল চাতালের উপর। ছিটকে বেরিয়ে এল একটা সাদা কাপড় মোড়া নারীদেহ। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই নিঃশব্দে ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এত তাড়াতাড়ি ঘটল, যে ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল মালতীর।

আকস্মিকতার আঘাত দুর হতে অনুভব করল, তার মুখের সামনের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হঠাৎ গৌরীশঙ্করের সাড়া পেয়ে বিমূঢ় ঠিকেদার মালতীর সামনের দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তুলে বন্ধ করে দিয়ে ছুটে সরে গেছে। হয়তো সেও এই অবস্থায় গৌরীশঙ্করের সামনে পড়লে মিথ্যা কলঙ্কের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে ভেবেই সরে গেল। কিংবা কিছু না ভেবেই গেল। দেখতে পেল না দুরন্ত রাগে গৌরীশঙ্কর কী ভাবে মুখুজ্যেকে আর তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আর মালতী? মালতী বারকয়েক তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত সেই সিঁড়ির গহ্বরে ছুটোছুটি করল নীচে থেকে উপরে, উপর থেকে নীচে। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ডাকতে লাগল…ননীবালা… পিসিমা….ছোটঠাকুরপো…কমলা…ছোটবৌ। ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলল। তারপর আর নাম করে ডাকল না, শুধু চেঁচাতে লাগল। আর্তনাদ…মুমূর্ষুর আর্তনাদ। বাতাস…বাতাস…নেই।… একতিল বাতাস নেই।

পাতালপুরীর গহ্বর থেকে ওঠা সেই আর্তনাদ পশ্চিম মহলে প্রভাবতীর কানে গিয়ে ধাক্কা মারল। প্রভাবতী চোখ বুজে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন।

ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল সেই আর্তনাদ, থেমে গেল ধীরে ধীরে। মালতীর পালঙ্কে আর কৌচে গড়াতে অভ্যস্ত নরম শরীরটা গড়িয়ে পড়ল সরু সিঁড়িটুকুর শেষ পৈঠেয়। কেউ এসে কোন দরজা খুলল না।

গৌরীশঙ্কর তখন আপন শয়নমন্দিরের দরজায় লাথি মেরে চলেছেন।…ধাক্কার পর ধাক্কায় খসে পড়ছে চুনবালি। শব্দে জেগে উঠেছে বাড়িসুদ্ধ লোক।

॥ তেইশ ॥

অনেকটা দূরে মাঠের ধারে গাছতলায় পালকিটা পড়েছিল। বেহারাদের চিহ্ন ছিল না সেখানে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে এসে মুখুজ্যে ওইটার মধ্যেই ঢুকে পড়ে লুকিয়ে বসে, বোধকরি দুর্গানামই জপ করছিল। চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরাভর, আর বেশি ছোটবারও সাহস নেই। রাতটা কাটলে বাঁচা যায়। কি জানি কর্তার কাছে কতটা কি বলেছে লখ্‌নার বৌ! এর আগেও তো দু-

দুটো। শুদ্দুরের মেয়ে চালিয়ে দিয়েছে মুখুজ্যে, এমন বিপদে তো পড়ে নি। উঃ, কি গেরোর কাজই হাতে নিয়েছিল মুখুজ্যে! কত জন্মের মহাপাতক ছিল তার। আরও কত পাতক সৃষ্টি করছে। ওই হাড়পাজী ঠিকেদারটাই হচ্ছে সকল নষ্টের মূল। বাবুকে কি মন্তর যে কানে দিল! কে জানে তলে তলে কত টাকা বাগাচ্ছে বাবুর কাছে? বিনি লাভে কি আর কেউ কিছু প্যাঁচ করে?

এই রাতারাতি দেশান্তরী হতে পারলেই ভাল হতো। বাবুর হাত ছাড়িয়ে একবার পালিয়ে আসতে পেরেছে, বারবার কি পারবে? তাছাড়া লক্ষ্মণ দাস? জেলের ছেলে! যদি বৌ হারামজাদী ছাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়ে সব ফাঁস করে দেয়? কিন্তু ছাড়া কি পাবে? কি কি বলেছে লখ্‌নার বৌ? জাত তো প্রকাশ করেছে। সধবা, সে কথাও বলেছে নাকি?

নাঃ, বাবুর কোপ থেকে ছাড়ান পাবার আর উপায় নেই। যে বাবু, কালাপানি পার হয়ে বিলেত চলে গেলেও ধরে এনে গলা টিপে ধরবে। গলাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আস্তে একটু মুখটা বাড়ায় মুখুজ্যে। আর সেই মুহূর্তে মাথাটা ঢুকিয়ে নেয়। ছুটে ছুটে কে যেন আসছে না? কিন্তু মাথা ঢুকিয়ে নিলেও পার পায় না। পালকির দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ছুটে আসা মানুষটা। বলে ওঠে—এই যে ঠাকুরমশাই, এখেনে বসে? উঃ, খুব ঠাঁই পেঠিয়েছিলে বাবা! একেবারে যমের দক্ষিণ দোরে!

মুখুজ্যে এতক্ষণে শাসাবার একটা লোক পেয়ে তেড়ে শাসিয়ে ওঠে —কি হল? পালিয়ে এলি যে?

—আসব না! ও বাবা, কে জানে যে 'যখ' আবার মানুষের মতন কথা কয়! পেরাণটা নিয়ে যে পেলিয়ে আসতে পেরেছি, এই মা দুগ্‌গার ভাগ্যি।

মুখুজ্যে তীক্ষ্ণচক্ষে ওকে দেখে নিয়ে ধমকে বলে—টাকা পাস নি?

যমুনা একটু কেঁপে ওঠে। কিন্তু যখের ধনের আশায় যে মেয়েমানুষ এতটা দুঃসাহসে ভর করে রাত্তির দুপুরে ঘরের বার হয়ে

আসতে পেরেছে সে আর যে কোন বিষয়ে যতই বোকা হোক, টাকার ব্যাপারে বোকা হয় না। গৌরীশঙ্করের ছুঁড়ে মারা তোড়াটা পেট-কাপড়ে চেপে ধরে সে খনখনে গলায় বলে ওঠে—কও কি কথা ঠাকুরমশায়! ট্যাকা! বলে পেরাণ নিয়ে পেলিয়ে আসতেই বাই জম্মে গেল! মিছে কথা বলে তুমি আমায় কম ভোগাস্তিটা করলে? কোথায় বা ট্যাকার ঘড়া, কোথায় বা কি! যখের চ্যাহারা দেখে আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। ন্যাও, আমায় এখন ঘরে যাবার বেবস্থা করে দাও দিকি।

—ঘরে যাবার ব্যবস্থা! মুখুজ্যে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠে বলল—ঘরে যাবার ব্যবস্থা করে দেব! আরও কিছু নয়? আমার কি দায় পড়েছে রে মাগী?

—গালমন্দ কোরো না ঠাকুরমশাই, গালমন্দ করতে এলে জেলের ঘরের মেয়ের সঙ্গে পেরে উঠবে নি। বলে যমুনো জেলেনীর মুখের তোড়ে চেৎলার বস্তি ঠাণ্ডা! ঘরে পৌঁছে না দিতে চাইলে আমি কেলেঙ্কার করব।

মুখুজ্যে দুর্বল গলায় বলে—তার মানে? কেলেঙ্কার করবি মানে? আমি তোকে ঘরের বার করে এনেছি নাকি মাগী?

—ফের ওই রকম অকথা কুকথা বলছ ঠাকুরমশাই? মাগী টাগী বললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার মতলব তো ভাল ঠেকছে না আমার। বলি রাতে রাতে ঘরে ফিরে না গেলে, সকালের আলোয় এই হাত-শুধু বেধবা মূর্তি নিয়ে পল্লীতে ঢুকব কি করে শুনি? কেষ্টার বাপ আসতে চেয়েছেল আমার সঙ্গে, তুমি আসতে দাও নি। সে বিশ্বেস করে ছেড়ে দেছে—

মুখুজ্যে হঠাৎ নরম হয়ে বলে—আহা, অত রেগে রেগে কথা কইছিস কেন? পাতালপুরীতে নেবে তোর হলটা কি তাই বল্ না?

—হবে আবার কি? যখকে দেখে তো আমার হাত পা ছেড়ে গেল। কী সে রাজার মতন চ্যাহারা, কী সে ভারী ভারী কথা! আমি বলনু, পায়ে ধরি বাবা ছেড়ে দাও।—হা হা করে হেসে দরজা খুলে

দিল। আমিও পড়ি তো মরি করে ছুটে চলে এনু।

—হারামজাদী। তুই তাকে একথা বলেছিলি তুই বামুনের মেয়ে নোস?

—ফের মুখ খারাপ করছ ঠাকুর? আমি বামুনের মেয়ে নই, একথা আবার তাকে ডেকে হেঁকে বলতে যাব কেন? ত্রিসংসারে কে আবার যমুনা জেলেনিকে না চেনে? বামুনের মেয়ের কথা তুলছ কেন? বাক্যি রেখে আমায় ঘরে পৌঁছে দাও ঠাকুরমশাই। নইলে ভাল হবে না।

—চিল্লাচ্ছে দেখ বেটি। ঘরে কেন, চল্ তোকে যমের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। বলেই হঠাৎ মুখুজ্যে তার দিকে তেড়ে আসে। আর সেই মহামুহূর্তে নিজেই 'আঁ আঁ' করে ওঠে পিছন থেকে গলার উপর প্রবল একটা চাপে।...আবার গলা টিপুনি। এতদূর ধাওয়া করেছেন কর্তাবাবু। কষ্টে ফিরে তাকাল মুখুজ্যে। সর্বনাশ! এ যে আর এক যম। বলে উঠল—তু-তু-তুমি! তুমি আমায়—

বেগতিক দেখে যমুনা নিজেই পালিয়েছে।

পালকির কাছে বসে আছে দুটো মানুষ। মুখুজ্যের আকুলতায় গলাটা ছেড়ে দিয়েছে ঠিকেদার। হাতটাও আর ধরছে না। বসে আছে গুম হয়ে। মুখুজ্যে কাতরাচ্ছে, গলায় হাত বুলোচ্ছে। খানিক পরে বলে ওঠে—তুমিই আমার এই সর্বনাশটি করলে ভাই। কোথা থেকে যে এই তান্ত্রিক সাধনা কর্তার মাথায় ঢোকালে। কুড়ি কুড়িটা বামুনের বিধবা, আমি পাই কোথায় বল তো? যোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা!

ঠিকেদার হঠাৎ একটা পৈশাচিক হাসি হেসে বলে—কেন, অভাব কিসের? তোদের বামনাদের ঘরে ঘরেই তো আছে।

মুখুজ্যে ম্লানভাবে বলে—আছে। তেমনি কড়া পাহারাও আছে। বেছে বেছে আমার বরাতেই এই কাজ পড়ল। বুঝেছি সবই আমার পাপের ফল। বুঝলে ভাই ঠিকেদার, আজ আমায় এ রকম দেখছ।

কিন্তু এক সময় আমিও তেজী বামুন ছিলাম। আমার বিধবা বোনের দিকে আমার একটা বন্ধু কুনজরে চেয়েছিল বলে, অবিশ্যি ঠিক কুনজরেও নয়, হতভাগা তাকে বেহ্মমতে বিয়ে করতেই চেয়েছিল। তা সে একই কথা। আমি ধর্মা-ধর্ম কুল-মানের মুখ চেয়ে আমার সেই দেবীপ্রতিমার মতন একমাত্র বোনকে বিষ খাইয়ে মেরে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে, আত্মঘাতী হয়েছে বলে রটিয়েছি। আর সেই আমি আজ—ও হো হো—কে! কে! কে। কে। কে তু—

কে, সেটা আর অপ্রকাশিত নেই ততক্ষণে। একটানে মুখের দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে দিয়ে রাম মুখুজ্যের গলা টিপে ধরেছে ঠিকেদার। একটা নারকীয় বীভৎস গলায় হুঙ্কার দিচ্ছে—চিনতে পারছিস না কে? পাষণ্ড শয়তান নরকের পোকা! বিষ খাইয়ে মেরেছিলি তুই পুনিকে! বিষ খাইয়ে মেরে ঝুলিয়ে রেখে মিথ্যে কথা বলেছিলি আমার কাছে? জোচ্চোর, ঠগ! তুই আমায় তুষানলে দগ্ধেছিস, প্রতিহিংসার নরকে পুড়িয়ে মেরেছিস। আমার ইহকাল খেয়েছিস, পরকাল খেয়েছিস। মানুষ থেকে পিশাচ করেছিস আমায়। ধর্মের ধ্বজা দেখিয়ে পুনি আমার সঙ্গে শঠতা করেছে ভেবে বিশ্বসুদ্ধ বামুনের মেয়েকে আমি নরকে পাঠাবার—

—ছেঃ ছেঃ দাঃ যোঃ গেঃ শ্বঃ।

—ছেড়ে দেব? তোকে ছেড়ে দেব! হা হা হা! তোর গলা ধরে একসঙ্গে যমের বাড়ি যাব না? নরকে গিয়ে একসঙ্গে গরম তেলের কড়ায় ডুবব না? যমদূতের হাতের ডাঙস খাব না? তুই আমার প্রাণের বন্ধু!

না, আত্মরক্ষার চেষ্টাও আর করতে পারল না রাম মুখুজ্যে। শুধু চোখ ঠিকরে তাকিয়ে থাকল পুরনো বন্ধুর দিকে। শক্ত হয়ে যাওয়া চোখ।

॥ চব্বিশ ॥

সে রাত্রে কি কোনও এক হিংস্র দানব বহুদিনের বুভুক্ষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিল পৃথিবীর এই ভূমিখণ্ডটুকুর ওপর ?

রুদ্ধশ্বাস বর্ষা সহসা সেই প্রশ্নই করে ওঠে। একই রাতে দু দুটো অপঘাত মৃত্যু! সে রাত্রে কি কোনও শয়তান দানব খিদের তাড়নায়—

অস্বাভাবিক ভদ্রলোক বলে ওঠেন—ভুল করেছেন মা জননী, দুটো নয়—তিনটে। টগরও তো সেই রাত্রে—

টগর!

—হ্যাঁ, টগরকে মরতে হল বৈকি। না মরে যাবে কোথায়? আর কি পরিণতি হবে টগরের মত কদর্য জন্তুর? হয়তো বা—হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। হ্যাঁ, দস্তুরমত হেসে উঠলেন।—হয়তো বা মালতীর পা টেপবার আর পান সাজবার চাকরীটা তার বজায়ই রইল। হয়তো বা সেখানে গিয়ে যখন মালতী বিক্ষুব্ধ প্রশ্ন করবে—তোর মনে এই ছিল টগর! আমায় মেরে—

তখন টগর অম্লানবদনে বলবে,—তা কি করব বলো বৌদিদি, তোমাদের মরণ বাঁচন তো তোমাদের হাতের মুঠোয়, তোমাদের খেলার পুতুল। আমরা যে আজন্ম শুধু মরেই আছি। আমাদের কি সাধ হয় না, একবারের জন্মেও বাঁচি!

মালতী তেতো হাসি হেসে বলবে হয়তো,—তা বাঁচলি তো?

টগর ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে,—সে কপাল করলে তো? বিধাতা-পুরুষের ওপর কি আর কলকাঠি চলবে? পৃথিবীতে বাঁচতেও তোমরা, মরতেও তোমরা। আমাদের বাঁচন নেই, মরণটা কেলেঙ্কার। গালে মুখে চুনকালি। কী লজ্জা, কী লজ্জা, শেষকালে কিনা আমাকে বাঘা ভূতো—

হ্যাঁ, বাঘা ভূতোই।

চেনা মানুষ বলে রেয়াৎ করে নি।

গাছ থেকে সরসর করে নেমে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়া মাত্র কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছিল তারা।

টগর যে চেনা মানুষ, সে কথা বোঝাতে টগরের কোনও কৌশলই কাজে লাগে নি।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল তারা টগরের দেহটাকে। ফেঁসে যাওয়া তুলোর বালিশের মত ছড়িয়ে পড়ে থেকেছিল টগর পুরো দুটো দিন।

তিন দিনের দিন দুর্গন্ধই জানান দিল। নইলে বাগানের একপ্রান্তে ঝোপের আড়ালে উঁকি দিতে যাবার উৎসাহই বা ছিল কার? চাকরাণী আর মনিবানী দুজনেই যে এই রাজপুরীর শেকল ভেঙে পলাতক হয়েছে, সে তো স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে মেনেই নিয়েছিল সবাই।

টগরের সেই ছেঁড়া তুলোর বালিশের মত লণ্ডভণ্ড দেহটা আর এক চিন্তার রাজ্যে নিয়ে গেল সবাইকে। যদিও দেহটাকে 'টগর' বলে চিনতে দেরী হয়েছিল, তবে বুঝতে দেরি হয় নি বাঘা আর ভূতো কেন কাল থেকে অমন পরিত্রাহী চীৎকার করতে করতে টানা-টানি করছিল সবাইকে।

কিন্তু বাঘা আর ভূতো কি শুধু টগরের দেহটাতেই হিংস্র আর ক্রুদ্ধ থাবা বসিয়েছিল?

তার হাতের সেই পুঁটলীটায় বসায় নি?

ছেঁড়া তুলোর মত করে ছড়িয়ে দেয় নি তার ভিতরকার বস্তুগুলো? যে বস্তুগুলোকে সংগ্রহ করেছিল টগর, তার ধর্ম অধর্ম, ন্যায় অন্যায়, বিবেক বিশ্বাস, ইহকাল পরকাল, সব কিছুর বিনিময়ে।

যারা বাগানে গিয়ে পড়েছিল, তাদের চোখ জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একা যায় নি কেউ। হায়, এমন ভাগ্যবান কি কেউ ছিল না এই দে-চৌধুরীদের আশ্রয়ে, যে আগের দিন শুধু

বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়তে পারতো বাগানের ওই একটেরে জায়গাটাতে? তা হলে তো মালতীর গহনাগুলোর হিসেব দিতে হত না কাউকে?

এখন দিতে হবে।

অনেকগুলো শ্যেনদৃষ্টি ঠিকরে উঠেছে রোদে ঠিকরে ওঠা সোনার চাপগুলোর ওপর। ওদের ঝলকানিতে টগরের মৃতদেহটা দ্বিতীয় আকর্ষণ হয়ে গেল। সনাক্ত করবার কিছু নেই। অন্তঃপুরের কে না চিনবে এ গহনা বড় বৌরাণীর।

না চিনতে শুধু গৌরীশঙ্কর।

হ্যাঁ, গৌরীশঙ্করই চিনতে পারেন নি। পারতেনও না কোনদিন। মালতী একদিন দুষ্টুমী করে ওর গলার কড়িহার ছড়া খুলে একটা রেকাবে করে ধরে এনে বলেছিল,—একজন অভাবে পড়ে বেচতে চাইছে, নেব? বেশ গড়ন।

শিউরে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর।—কার না কার পুরনো জিনিস, তুমি গলায় পরবে?

—সোনায় দোষ নেই। মালতী বলেছিল,—সোনা কি পুরানো হয়?

—তা হোক। আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর,—কেউ অভাবে পড়ে বেচছে, এমন জিনিস তুমি নিতে যাবে? ছি ছি!

—বাঃ, তার তো এতে উপকার।

—তা হোক।

—তার মানে বড় বৌরাণীর নামে এখন টাকার বরাদ্দ হবে না কেমন? বাঁকা হাসি হেসেছিল মালতী।

—গৌরীশঙ্কর মরমে মরে গিয়েছিলেন।—ছি ছি, এ তুমি কি বলছ, বড় বৌরাণী! কত টাকা চাই বলো? যার গহনা, তাকে এমনিই বিলোও গে তুমি। আর তোমার কি কি গহনা চাই বলো। এক্ষুণি—

—আপাততঃ আমার এই হারটা চাই। 'জোড়া ভুজঙ্গ' হার। বলে গৌরীশঙ্করের হাত ছুখানা তুলে নিয়ে গলায় জড়িয়ে হি হি করে হেসে উঠেছিল মালতী। তারপরই অভিমান-কাঁপা গলায় বলেছিল, —একটা জিনিস প্রমাণ হল।

—কি গো। কী প্রমাণ?

—তুমি যে আমার দিকে তাকিয়েও দেখ না, সেই প্রমাণ। এ হার চিনতে পারলে না তুমি? আমি আজ অন্ততঃ ছ মাস গলায় পরছি।

হা হা করে হেসে উঠেছিলেন গৌরীশঙ্কর।

—এই কথা! কিন্তু বৌরাণী, আমি যখন তোমায় দেখি, তখন কি তোমার অলঙ্কার আভরণ দেখি? মুখ থেকে যে চোখ নামে না।

—থাক. ঢের হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর গম্ভীর হলেন একটু, বললেন.—কিছুই হয় নি বৌরাণী। কিছুই বলা হয় না। তবে যদি বল—! কিন্তু ওটা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। ও আর একটা বস্তু, ওটা হচ্ছে পুরুষের সম্ভ্রম। আর ঘরের বৌয়ের সম্মানও বটে। পুরুষ হলো ছুরন্ত দানবের জাত, তার উন্মাদ ক্ষিদে মেটাতে—

—থাক থাক, তোমাকে আর বোঝাতে হবে না। মালতী গৌরীশঙ্করের মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়েছিল। তারপর কৌতুকের দৃষ্টি হেনে বলেছিল,—ওসব যাক, টাকার বরাদ্দ হয়ে গেছে তো? ওই টাকায় তবে ঠাকুরপোর জন্যে ইংরিজির মাস্টার রাখা হোক।

এসব অনেক দিনের কথা। তা হোক, সেদিন ঠকে গিয়েও মালতীর গহনা চিনে রাখবার দায় পড়ে নি গৌরীশঙ্করের।

ওঁর কাছে যখন সব গহনা এনে ধরে দেওয়া হল, উনি শুয়ে শুয়েই নির্লিপ্ত স্বরে বললেন,—কী এসব?

হ্যাঁ, শুয়েই ছিলেন গৌরীশঙ্কর। কত দিন কত রাত যেন শুধু শুয়েই ছিলেন।

শুয়ে শুয়েই শুনেছিলেন, টগরকে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বাগানে পাওয়া গেছে। শুনেছিলেন, ঠিকেদার আর রাম মুখুজ্যে একযোগে দুটো মানুষ নাকি সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ। শুনেছিলেন, প্রভাবতী নাকি এ সংসার থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন। কোন প্রশ্ন করেন নি। করেন নি কোন প্রতিবাদ। গহনাগুলো সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন করলেন না। শুধু বললেন, আমার কাছে এসব এনেছ কি জন্যে? পিসিমাকে দিয়ে দাও গে।

—পিসিমা! পিসিমাকে দিয়ে দেব!

—তাই তো বলছি। পিসিমার কাজে লাগতে পারে। বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে রয়েছে।

ওরা নিশ্বাস ফেলে বলল—বৌরাণীর গায়ের গহনাগুলো—

—বেশী কথা বাড়াচ্ছ কেন? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে হবে? ওই অভিশপ্ত জিনিসগুলো আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

কিন্তু গহনাগুলো বুঝি সত্যিই অভিশপ্ত। তাই প্রভাবতী নিজে এলেন সেগুলো ফেরত দিতে।

বললেন,—এগুলো আমার কাছে রাখতে পাঠিয়েছিস কেন গৌরী? সরকার মশাইকে দিয়ে 'তোষখানায়' তুলিয়ে রাখ।

গৌরীশঙ্কর নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার কাছে রাখতে পাঠাই নি পিসিমা, দিতে পাঠিয়ে ছিলাম। হয়তো তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবে—

প্রভাবতী শান্তস্বরে বললেন,—'বড় বৌমার শখের জিনিস' একথা তুলে আর কথা বাড়াব না গৌরী, তবে এত গহনা আমার কি কাজে লাগবে বাবা?

গৌরীশঙ্কর হয়তো অনেক কিছুই বলতে পারতেন, বলতে পারতেন সোনা কাজে লাগবে না, এটা মাত্র পাগলেই বলতে পারে, কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না তিনি, শুধু আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললেন,

তোমাদের বড়বৌ একদিন বলেছিল সোনায় নাকি পুরনোর দোষ লাগে না। কমলার বিয়েতে তো গহনা লাগবে—।

প্রভাবতী এক নিমেষে চুপ করে থেকে বললেন,—তুমি বুদ্ধিমান, বললে তুমি বুঝবে, তাই বলছি আর ঋণের বোঝা বাড়াব না। কমলাকে যদি কেউ শুধু রাঙা শাঁখা হাতে দিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তার ঘরেই বিয়ে দেব কমলার। নচেৎ আমার ঘরেই থাকবে।

গৌরীশঙ্কর ম্লান হেসে বলেন,—তোমার মন মেজাজ এখন ভাল নেই পিসিমা, তাই এমন অদ্ভুত কথা বলছ। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। বিয়ে না দিলে কি আর চলে? এমনিতেই তো যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে। বিয়ে এবার তাড়াতাড়িই দিতে হবে।

প্রভাবতী বললেন,—তা দিতেই যদি হয়, সে বিয়ে হেমন্ত মুটেগিরি করেও দেবে। হেমন্ত যদি মানুষ হতে চায়, মানুষ হবার গোড়ার কথা যেন শেখে।

—হেমন্ত কি তাহলে আর পড়বে না?

—ভগবান যদি পড়বার সুযোগ দেন, পড়বে।

গৌরীশঙ্কর আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—একটা কথা শুনে যাও পিসিমা, তোমাদের বড়বৌকে তোমরা যত মন্দ ভাবতে, সে তা নয়।

প্রভাবতী এই ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা কঠিন কথা সংবরণ করে নিয়ে বললেন,—আমি কাউকেই মন্দ ভাবি না গৌরী। মন্দ ভাবি শুধু নিজের অদেষ্টকে।

কমলা এসে প্রণাম করল। গৌরীশঙ্কর বললেন—থাক থাক। এ সংসারে অনেক অপমান সয়ে গেলে, পারো তো ভুলে যেও। পিসিমা ভালই করেছেন।

হেমন্ত এসে দাঁড়াল। বলল—বড় বৌরাণীকে খোঁজার চেষ্টা কি কিছুতেই করা চলে না দাদা?

—লাভ কি? মৃদু হাসলেন গৌরীশঙ্কর।

—আমার মনে হয় কোনখানে একটা বড় ভুল হচ্ছে।

—হয়তো হচ্ছে। তবে কার তাই ভাবছি। অনেক জায়গায় অনেক অনাচার ঘটেছে, তার একটা প্রতিফল তো আসবেই হেমন্ত। যাক, তোর পড়ার বইগুলো কি নিচ্ছিস না?

হেমন্ত মাথা নীচু করে চোখের জল সামলে বলে—মার ইচ্ছে নয়।

—তবে থাক। বইগুলো তোর বৌরাণীর দেওয়া, তাই না?

—আমার সবই তো বৌরাণীর দেওয়া দাদা। হেমন্ত কষ্টে আবেগ প্রশমিত করে।···গৌরীশঙ্কর চোখ বুজলেন, চোখ বুজেই থাকলেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল হেমন্ত।

গৌরীশঙ্করের হয়তো আর তার কথা মনে রইল না। গৌরীশঙ্কর অন্য কথা ভাবলেন। ভাবলেন—একশো বছর পরমায়ু, আর চিরযৌবন। এই জিনিসটাকে কোন্ দুর্মতির বশে খুব একটা লোভনীয় ঐশ্বর্য ভেবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম! কী বোকামী, কী মূঢ়তা। যদি সত্যই তেমন অবস্থা ঘটে, কী করব আমি সেই বিধাতার ব্যঙ্গের পসরা নিয়ে। সবাই বুড়ো হয়ে মরে যাবে, সবাই আমাকে ছেড়ে যাবে, শুধু আমি বয়েস আর শক্তি নিয়ে, পশুর উল্লাসে বেঁচে থাকব। কী অদ্ভুত কল্পনা! ভাবলেন মালতী যদি থাকতো প্রভাবতীর মত অমনি এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে একবস্ত্রে চলে যেতেন গৌরীশঙ্কর। যেতে পারতেন। আশ্চর্য, মালতী থাকতে এ ইচ্ছে হয় নি কেন!

লোক দুটো পালিয়ে গেছে। মুখুজ্যে আর ঠিকেদার। আমার পাপের সঙ্গী। কে জানে আবার কোথায় বিষগাছ রোপণ করতে গেল ওরা! বন্দী করা মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা কে জানে। ছেড়ে দিতে হবে। কে দেবে? গৌরীশঙ্কর ছাড়া আর কে। বাইরে থেকে নয়, এই ঘর থেকে নেমে যাবেন। পাতালপুরীর সিঁড়ি ধরে। টাকার তোড়া ধরে দিয়ে বিদায় দেবেন তাদের। মুখুজ্যেটা বলছে, বিদেয় পাওয়াটাই ওদের ভয়। তাহলে? যদি যেতে না চায়? যদি গৌরীশঙ্করকে বলে—তুমি আমাদের সংসারের পবিত্র জীবন থেকে উপড়ে এনে পায়ে মাড়িয়ে ক্লেদাক্ত করেছ, আমাদের

দায়িত্ব তুমি ছাড়া কে নেবে ?

কি করবেন গৌরীশঙ্কর ? অনেকক্ষণ ভেবে এক সময় আস্তে উঠলেন, ঘরের ভিতর দিকের দরজাটা—এই যে এই দরজা—গল্প বলা ভদ্রলোক দরজাটা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ফের শুরু করলেন, —হ্যাঁ। এই দরজাটা বন্ধ করে ফেললেন ভাল করে।

সভয়ে আমরা দরজার দিক থেকে একটু সরে এলাম। ভদ্রলোক সেদিকে কটাক্ষ করে মৃদু হেসে বললেন—

—বন্ধ করে ফেলে সরে এলেন দেয়াল-আলমারির কাছে। হাতল ঘুরিয়ে দেখলেন চাবি বন্ধ। এ চাবি কার কাছে ছিল ? বৌরাণীর ? তাই হবে হয়তো। ওর দ্বিতীয় চাবিটা ? অনেক খুঁজে খুঁজে বার করলেন। লাগালেন, মোচড় দিলেন, খুলে ফেললেন পাল্লাটা। আর আলমারীর গহ্বরের কিসের একটা উৎকট গন্ধ যেন ধাক্কা মারল। নতুন দেয়ালের মধ্যে হঠাৎ এমন ভয়ানক ভ্যাপসা গন্ধ কেন ! তাহলে তো পরিষ্কার করানো দরকার। আবার ভাবলেন—আমার কি আর কোন কিছুতেই দরকার আছে। তবু পাল্লাটা বন্ধ করে ফেললেন না, কুলুঙ্গীর মধ্যে হাত গলিয়ে চোরা তক্তাটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে শিউরে সরে এলেন। যেন একটা গলিত শবের গন্ধ তাঁর মুখের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কী ! কী এখানে ? কী পচেছে ? কোন বেড়াল-টেড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়ে আটকে গেছে ? কোথা থেকে ঢুকবে ? কখন ? কে খুলেছিল এ পথ ? যে বলতে পারত তাকে আর কোনদিনই কোন প্রশ্ন করবেন না গৌরীশঙ্কর। জিজ্ঞেস করতে পারবেন না—বৌরাণী, এটা হঠাৎ খোলবার শখ হয়েছিল কেন বল তো তোমার ? তুমি তো ভয় পাও। আর যদি শখই হয়েছিল, একটা জীবজন্তু ওর মধ্যে ঢুকে আটকে গেল কি না দেখবে তো।

এ উৎকট গন্ধের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। উঠে এলেন, নীচে নেমে পাতাল-ঘরের খবরদারি করা চাকরগুলোকে ডেকে

বললেন—দরজা খোল।

দরজা তারা খোলবার জন্যেই হাঁ করে ছিল। গন্ধ তো তারাও পাচ্ছিল। শুধু হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। যে দরজা ঠিকেদার বন্ধ করে দিয়েছিল সেই দরজা খুলে ফেলল তারা, আর সঙ্গে সঙ্গে 'রাম রাম' রবে একটা উৎকট চীৎকার করে সরে এল। শুধু বিকট গন্ধই নয়, খোলা দরজাটার সামনে ছড়িয়ে পড়ে আছে একরাশ এলোচুল।

অস্ফুট চীৎকার করে উঠল বর্ষা। আর লোকটা স্পষ্ট হেসে উঠল। —ভয় পাচ্ছেন?

॥ পঁচিশ ॥

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। গৌরীশঙ্কর নিজের সমস্ত সম্পত্তি ভবানীশঙ্করের নামে লিখে দিয়ে তীর্থবাসের সঙ্কল্প নিয়ে চলে গেলেন। ভবানীশঙ্কর একদিন বেহেড মাতাল হয়ে মদের ঝোঁকে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেলেন।··· হ্যাঁ, এই বাড়ির ছাদ, এই ঘরেরই। দক্ষিণ দিক বলে ছাদের এদিকটাতেই বসতে আসতেন ভবানীশঙ্কর।

ভবানীশঙ্করের শোচনীয় মৃত্যুর পর চারুহাসিনী পুরো কর্তা হল সংসারের। গুরুজন বলে আর রইল না কেউ। অতঃপর সে ঘোষণা করল, এত আশ্রিত পোষণ করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, যে যার পথ দেখুক; শুনে কেউ তেজ করে তক্ষুনি চলে গেল, কেউ কিছু কাকুতি মিনতি করে মেয়াদ বাড়িয়ে নিল, কেউ কথা গায়ে মাখল না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে সকলকেই হল। চারুহাসিনী স্থির-সঙ্কল্প। পুরনো কাউকে রাখবে না। একে একে পুরনো লোক সবাই চলে যাবার পর চারুহাসিনীর এক দূর-সম্পর্কীয় ভগ্নীপতি এসে বাসা বাঁধল এখানে।

বোন নেই, শুধু ভগ্নীপতি।

কাজেই তার সেবাযত্নর জন্যে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার।

স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখটাই যদি তার লাঘব করতে না পারল চারুহাসিনী, তবে আর বলে-কয়ে আনা কেন তাকে ? শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে ? চারুহাসিনী কি এতই চোখের চামড়াহীন ?

হ্যাঁ, আনবার সময় অবিশ্যি নিজের উপকারের কথাই তুলেছিল। সেটাই সভ্যতা। না হলে সে মানুষটা আসতে চাইবে কেন ? তাই তাকে বলতে হয়েছিল,—মাথার ওপর হিতৈষী বলতে কেউ নেই, তুমি আছ আত্মজন, তুমি এসে হাল ধরো। নইলে, এই অগাধ বিষয় বারো-ভূতে লুটে খাবে।

পরোপকারী জীবনরতন, হ্যাঁ ওই নাম ছিল লোকটার, এমন আকুল আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারল না। চলে এল একদিন, গামছায় মুড়ে দুখানা ধুতি হাতে করে।

চারুহাসিনী, বাড়িতে যারা তখনও ছিল তাদের, বলে বেড়াল— পরিবার গিয়ে অবধি মানুষটা সর্বত্যাগী সন্নিসী হয়ে আছে। নইলে ওদের বোলবোলাও কি কম ছিল। অথচ দেখ, এসেছে যেন ফকিরের মত।

তা পুরনো মোসাহেবের দল কিছু কিছু ছিল। যারা পায়ের ধুলো জিভে চাটতে পারে। তারা আড়ালে মুখ মুচকে হেসে মুখে সরলতা দেখিয়ে বলল,—তা তুমি ওর বৈরিগীগিরি ঘোচাও। বড় শালী হও তুমি। এই রূপের কান্তি মানুষটা, ওই বয়সে সন্নিসী হয়ে যাবে ?

চারুহাসিনী হৃষ্টচিত্তে বলল,—তাই করতে হবে। নইলে আর কিসের আত্মজন ?

তা বৈরাগীকে অনুরাগী করে তুলতে বেশী কাঠখড় পোড়াতে হল না চারুহাসিনীকে। জীবনরতন [illegible] সার বস্তুটা যে কী, তা ভালই শিখে এসেছিল।

ফুল কোঁচানো শিমলের ধুতি, জরিপাড় উড়ুনি, রেলির বাড়ির থানের বেনিয়ান আর সাহেব বাড়ির পাম্পসু পরে চাদরে ফরাসী এসেন্স মাখতে মাখতে সে যখন উদাস মুখে বলতো—এ শুধু সেজদির

মন রাখতে সং-সাজা। নইলে এ সবে কি আর স্পৃহা আছে? তখন লোকের হাসি দুর্দমনীয় হয়ে উঠলেও মুখে বলতেই হতো,—তা সত্যি, আপনার মমতার প্রাণ। আর ছোট বৌরাণীরও তো প্রাণের মধ্যেটা খাঁ খাঁ করছে, আপনাকে খাইয়ে মাখিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে যদি একটু শীতল হয়—

তা শীতল হবার সাধনায় চারুহাসিনী প্রায় উন্মাদ হয়েই উঠেছিল। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান, লোকলজ্জা, চক্ষুলজ্জা. সভ্যতা, সমাজ, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, জীবনরতনকে দিয়ে জীবন শীতল করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল।

বদলোকে এমন কথাও রটিয়েছে, বিধবা চারুহাসিনী নাকি জীবন-রতনের আদরে আবদারে তার সঙ্গে এক পাতে বসে খেয়েছে পর্যন্ত। সাহেব বাড়ির খানা, সে নাকি একা বসে খেতে জীবনরতনের ঘাস পাতার মত লাগে।

সে যাক, ওসব দুষ্টু লোকের দুষ্টু কথা। তবে হ্যাঁ, চিরদিনের বুভুক্ষু প্রাণটা চারুহাসিনীর হঠাৎ এই অদ্ভুত একটা পথ পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখত না, বোনাইয়ের কখন কি দরকার সেই নিয়েই মেতে থাকতো।

জীবনরতন ঘুঘু ব্যক্তি।

চারুহাসিনীর এ বুভুক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে নিল সে।

এবং শনৈঃ পন্থার পথ ধরে সে একদিন নিরক্ষর চারুহাসিনীকে কথার জালে ভুলিয়ে টিপ্ সই দিইয়ে নিয়ে সব বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলল। পরে নাকি চারুহাসিনীর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছল। রাস্তায় রাস্তায় নাকি ঘুরে বেড়াত। সেই শ্বেতহস্তীর মতন চেহারা নাকি দাঁড়কাকের মতন হয়ে গেছল। তার তিনটে ছেলেমেয়ে পরে নাকি ভিখিরীর মত মানুষ হয়েছিল সেই দূর সম্পর্কের মেসোর সংসারে। হ্যাঁ, সংসারটা তো তারই হয়ে গেল।

আর গৌরীশঙ্করের মেয়েটা ? তাকে গৌরীশঙ্কর তীর্থ যাত্রার সময় তার মামার বাড়িতে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। দে চৌধুরীদের ইতিহাস এমনিভাবে হাউইয়ের মতন জ্বলেই নিভে গেল। এ বাড়ির তার পরের ইতিহাস ওই চারুহাসিনীর ভগ্নীপতি জীবনরতনের। সে লোকটার প্রথম কাজ হল ওই চোরা সিঁড়ির পথ ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া।

আর এই ঘর, মালতীর শোবার ঘর, যে ঘরে বসে কথা কইছি আমরা···এই ঘরটাকে জন্মের শোধ বন্ধ করে রেখে দিল তালা চাবি দিয়ে। এদিকের বারান্দা দিয়ে পর্যন্ত হাঁটতো না কেউ ওরা, ঘুরে ওদিক দিয়ে যাওয়া আসা করতো। সবাই বলত, রাতে নাকি ওই ঘর থেকে আলো দেখা যায়, গহনার ঝমঝমানি শোনা যায়, আর কোথা থেকে নাকি চাপা শব্দ ওঠে—'দোর খুলে দে, দোর খুলে দে !'

সঙ্গে সঙ্গে এখানেও একটা চাপা শব্দ উঠল,—আ গেল যা ছোঁড়া, সরতে সরতে যে একেবারে ঘাড়ের ওপর আসছিস ! ছুঁয়ে দিবি নাকি ?

এ স্বর বামুনদির !

বুঝতে অসুবিধে হয় না, গল্পের শ্রোতা ওরাও। ঘরের দরজার কাছেই আছে। এবং রাত্রির পটভূমিকায় এ গল্প আমার বালক ভৃত্যটিকে এতই বিচলিত করে তুলেছে যে, সে নিষ্ঠাবতী বামুনদির কড়া শাসন বিস্মৃত হয়ে তাঁর কাছ ঘেঁষে আশ্রয় নিতে গেছে। বামুনদির তাই এই তর্জন।

এই একটা ফাঁক পেয়ে বলে উঠি—বর্ষা দেখো তো, বামুনদি বোধহয় কিছু বলছেন।

—বামুনদি আবার কি বলবে, দুলালকে বকছে,—বলে আমার উদ্বেগে বরফজল নিক্ষেপ করে বর্ষা জেদের সুরে বলে—আমি এ গল্পের শেষ শুনতে চাই। শেষ না শুনে উঠব না। বলুন আপনি।

—এইতো—বাবু যে এদিকে চটছেন।

—চটুন। আপনি বলুন ওই ভগ্নীপতিটা কি করল শেষ অবধি।

—বলছি—বাবু আমার দোষ দেবেন না কিন্তু।

এই ভগ্নীপতিটা ছিল এক নম্বরের বেনে, আর কৃপণের হাড়, তবু ভয় পেয়ে রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কেউ নাকি থাকতে পারল না, ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। ক্রমশ বাড়িটাকে সে একটা আড়ত বাড়ি করে তুলল। হাতে পয়সা পেয়ে নিজের যে একটা তিল-তিসি-মসনের ছোট্ট ব্যবসা ছিল সেটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বিরাট করে তুলেছিল, তাই বস্তা বস্তা তিল তিসি মসনে এনে মজুত করতে লাগল বাড়িতে। যাচ্ছেতাই নোংরা হয়ে গেল বাড়ি।

সর্বদা আজেবাজে গাদা গাদা লোকে বাড়ি বোঝাই হয়ে থাকার দরুন গা-ছমছমে ভয়-ভয়টা কিছু কেটেছিল, কিন্তু ভগবান জানেন কেন একদিন লোকটাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল তার তিসির বস্তার গাদার পাশে ঘাড় গুঁজে।

কেন যে অমন করে মারা গেল লোকটা কেউ সন্ধান করতে পারল না। বলল, কড়িকাঠ সমান উঁচু থাক দেওয়া বস্তার গরমে বদ্ধ ঘরে দম আটকে মরেছে। কেউ বলল, বস্তা ডিঙোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাথার শির ছিঁড়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলল, ভবানীশঙ্করের প্রেতাত্মা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেদিন বেশি রাত্রে একা পেয়ে—

॥ ছাব্বিশ ॥

তারপর কতবারই যে হাত-ফেরতা হল বাড়িটা। ওই হৃতভাগা জীবনরতনের পর মালিক হল তার ভাইপো। সে কাকার ব্যবসা বাণিজ্য সব লাটে তুলে দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে গুছিয়ে বসল। কাঁচা বয়স, আর হাতে কাঁচা পয়সা, বিলাসিতায় গা ভাসাতে দেরী হল না তার। আর সেই ঝোঁকে ভোল ফিরিয়ে ফেলল বাড়িটার। শৌখিন

মিস্তিরি এনে দেয়ালে দেয়ালে রং করাল, ফুল কাটাল, যার চিহ্ন আপনিও হয়তো কোথাও কোনখানে দেখে থাকবেন, জানলা দরজায় নতুন রং করল, আর সারা বাড়িটাকে সাজিয়ে ফেলল একেবারে সাহেবী কেতায়। লেসের পর্দায় মেজের কার্পেটে, নতুন ধরনের কৌচ কেদারা আয়না টেবিল পুতুল ফুলদানীতে ঘর যেন বাইজীখানা হয়ে উঠল। এ বাড়ি দেখলে দে চৌধুরীরা নির্ঘাৎ নিজেদের অকিঞ্চিৎকরতা স্মরণ করে লজ্জায় মাথা হেঁট করতো।

যাক আবার ভাগ্যি ফিরল এ মহলের। কাকার ভয়ের সংস্কারকে উড়িয়ে দিয়ে ভাইপো দোতলার এই ঘরকেই সেরা করে সাজিয়ে বৈঠকখানা বানাল। এইটাই দক্ষিণমহল, এটাই সবচেয়ে ভাল। ইয়ার-বন্ধুর দল আসতে লাগল, ফের বোতল গেলাসের টুংটাং আওয়াজ উঠল বাড়িতে।

কিন্তু এ বাড়ির সমস্ত ইটকাঠই বুঝি অভিশপ্ত। তাই বেশিদিন ভোগ করতে পায় না কেউ। টিঁকতে পায় না, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগজাত করবার অবকাশ পায় না। ভাইপোরও সময় ফুরিয়ে এল। একদিন বন্ধুবর্গের সঙ্গে ইয়ারকি আড্ডা দিতে দিতে পেটের ব্যথায় ছটফট করে শুয়ে পড়ল।

বন্ধুরা বলল—অতিরিক্তি মদ খেয়ে এই অবস্থা। ওরই মধ্যে একজন দয়াপরবশ হয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে গেল।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন। পাড়ার কবরেজ নাক তুলে বলল—এখন এই ভরসন্ধ্যোয় ওই মোদো-মাতাল রুগীকে স্পর্শ করে আমি স্নান করতে পারব না।

বন্ধু ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি চেপে ডাক্তার নিয়ে এল ভিন্‌পাড়া থেকে।

ডাক্তার নামল গাড়ি থেকে, কালো কোট পেণ্টুলুন পরা, মাথায় হ্যাট, বুকপকেটে সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, কন্দর্পের মত কান্তি। বাড়ির মেয়েরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে ডাক্তারকে দেখতে লাগল। ডাক্তার নাকি খুব নামকরা, খুব নাকি পশার তার। কিন্তু কি যে হল

ডাক্তারের, রুগী না দেখে, হাঁ করে কেবল বাড়িটাকে দেখতে লাগল। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল জন্মে বুঝি এমন সাজানো বাড়ি-ঘর দেখে নি। শেষে থাকতে না পেরে একটা বন্ধু—মানে মাতাল তো—বলে উঠল—বাড়ির সাজসজ্জে দেখে আপনিই যে জ্ঞান হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু, অজ্ঞান রুগীটার জ্ঞান ফেরাবে কে ?

লজ্জা পেয়ে তবে রুগী দেখল ডাক্তার। আর দেখে চমকে গেল। বলল, শেষের ঘণ্টা তো বেজে গেছে দেখছি।

বন্ধুরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। বিনি পয়সায় মদ আর আড্ডা, রোজ রাত্রে ঘটার ভোজ। এ সব তাহলে বন্ধ হলো এবার। হৈ চৈ করে বলে উঠল—ওকথা বললে শুনব না ডাক্তারবাবু। বাঁচাতে হবে। যত টাকা লাগে লাগুক। ঘরে ওর কাঁচা বয়সের বৌ।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল,—টাকা দিয়ে প্রাণ কেনা যায় না। আর ছেলেমানুষ বৌ, কি বুড়ো মা, এসব কথা যমে শোনে না। যাক যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। গরম জল চাই বেশি করে, আর—

যা যা দরকার সব বলে দিল ডাক্তার। কিন্তু ছুটোছুটি করে যে ছোকরা চাকরটা সমস্ত ফাই-ফরমাশ খাটতে লাগল, তাকে দেখে ডাক্তারের মনে অনবরতই কেমন একটা স্মৃতির আলোড়ন উঠতে লাগল। কার মত দেখতে চাকরটা ? কোথায় একে দেখেছি ? কিন্তু বেশি চিন্তা করবার সময় তখন ছিল না, রুগী নিয়ে রসাতল চলল, মিটল শেষ রাত্রে।

অন্দরমহল থেকে যে প্রবল মড়াকান্না উঠল, তার থেকে আর আলাদা করে চেনা গেল না, সত্তমৃতের কাঁচা বয়সের বৌয়ের আর্তনাদ কোন্‌টা।

সারা রাত্তিরের যুদ্ধের পর ক্লান্ত ডাক্তার চুপ করে বসেছিল পাশের ওই বারান্দায় একটা আরাম কেদারায়। ও বারান্দা থেকে নীচের বাগান দেখা যায়, আর অনেক দিনের পুরনো একটা চাঁপা গাছের ডাল ওই বারান্দায় এসে ধাক্কা মারে। এই দৃশ্যটার মধ্যে এত অবাক হবার কি আছে কে জানে। ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল

সেই সকালের রোদলাগা পাতার ঝিলমিলের দিকে। কাল সন্ধ্যার সেই চাকরটা এসে বলল—ডাক্তারবাবু, বাড়িতে জিজ্ঞেস করছে তোমার ভিজিট কত?

—ভিজিট? ডাক্তার 'তুমি' শুনে চমকে উঠে তারপর বলল,—ভিজিট নেবার মত কাজ তো আমি করতে পারি নি। বলগে, ডাক্তারবাবু ভিজিট নেবেন না। এক্ষুনি চলে যাবেন।

ছোকরা চলে গেল। ডাক্তার দেখল তার গায়ের ফতুয়ার পিঠটায় লম্বালম্বি একটা ছেঁড়া, আর ছেঁড়ার ফাটল দিয়ে ফর্সা ফুটফুটে রংটা উঁকি মারছে। ছোকরার মুখ হাত তো এমন ফর্সা নয়, কেমন যেন লালচে তামাটে। কিন্তু গা-টা যেন ওই চাঁপা ফুল খানিকটা। ডাক্তার ভাবল—চাকর এত ফর্সা!

ছোকরা আবার ফিরে এল, বলল—বাড়িতে বললেন যে, তুমি তো চেষ্টার কসুর কর নি, প্রমাই ফুরোলে মানুষের হাত কি? তুমি সারারাত খেটেছ, হকের ধন ছাড়বে কেন?

—কে বলল?

—এ বাড়ির গিন্নী।

—যিনি মারা গেলেন, তাঁর মা?

—না। তাঁর খুড়ি।

—তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ?

ছোকরার মুখটা যেন একবার দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তারপর মুখ তুলে ম্লান গলায় বলল—এ বাড়িটা আমাদের। গিন্নী আমার মাসী হয়।

ডাক্তার আরামের শিথিলতা ত্যাগ করে খাড়া হয়ে উঠে বসল। বলল—বাড়িটা তোমাদের! নাম কি তোমার?

—কালীশঙ্কর দে চৌধুরী।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর শিথিলভাবে বলল—তুই শঙ্কু! তোকে চাকর করে রেখেছে এরা?

॥ সাতাশ ॥

আবার গল্পে ছেদ পড়ল।

নাঃ, বর্ষার ভাগ্যে ব্যাঘাত আছেই।

বামুনদি অসহিষ্ণু স্বরে প্রশ্ন করছেন,—হ্যাঁগা বৌদিদি, খাওয়া-দাওয়া তা'হলে আজ আর হবে না, মাঝরাত্তির পার হতে যায়, ওঠার নাম দেখছি না।

বর্ষা ক্রুদ্ধ জেদী গলায় বলে—না, দেখবে না। তোমরা খেয়ে নাও গে।

—আমরা খেয়ে নেব!

—নেবে বৈ আর কি করবে? আমাদের এখন ওঠার দেরী আছে। খালি খালি বিরক্তি। নিন গল্পটা শেষ করুন।

গল্পটা আর কি, তারপর এই বাড়ি নিয়ে চলল মামলা। একদিকে নাবালক মালিকের পক্ষে তার দূর সম্পর্কের কাকা ডাক্তার হেমন্ত ঘোষ, আর অপরদিকে জবর-দখলকারী মৃত রাজমোহন মিত্রের শ্বশুর। অনেক কাঠ-খড় পুড়ল, অনেক জল ঘোলালো, তারপর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে চলে গেল। চারুহাসিনী দাসীর তার ভগ্নীপতিকে দেওয়া দানপত্র বাতিল হয়ে গেল। প্রমাণ হল, তাকে ঠকিয়ে এ কাজ করানো হয়েছে। পড়তে জানতো না, টিপসই করিয়ে নিয়েছে। দলিলে তার পক্ষের কোন সাক্ষী নেই। শেষপর্যন্ত জবরদখলকারীরা দখল ছাড়তে বাধ্য হল, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ হয়ে নাবালক কালীশঙ্কর সম্পত্তি পেল। সে কাতর হয়ে বলল—ডাক্তারকাকা, তুমি থাকো।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল—না।

—আমাকে বোকা মুখ্যু পেয়ে আবার কে কোথায় কি ঠকিয়ে নেবে।

—বোকা মুখ্যু হয়ে থাকলি কেন?

—কি করব। ইস্কুলের মাইনে দিত না কেউ, বাড়িতে রাতদিন কাজ করাতো, মাস্টারের কাছে পড়া বলতে পারতাম না, নাম কেটে দিল।

—চাকরের মতন খাটতিস কেন?

—না খাটলে বকতো, মারতো। অভ্যাস হয়ে গেল তারপর। নিজেকে চাকরই মনে হতে লাগল।

—তোর দিদি দুটো?

—বিয়ে হয়ে গেছে। রাজমোহনদার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের অগাবগা দুটো পাত্তর ছিল—

—চমৎকার! তোর মা বাবার কি অসুখ হয়েছিল?

—বাবা তো ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছল। আর মা মাথা খারাপ হয়ে ভুগে ভুগে--

—এ বাড়ির ইঁট কাঠে অভিশাপ আছে শঙ্কু। তুই সাবালক হয়ে বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাস অন্য কোথাও।

—ডাক্তারকাকা, মা একদিন আমাকে স্বপ্ন দিয়েছিল। মাও বলেছিল—পালা শঙ্কু, পালা। নইলে বাঁচবি না। এ বাড়ি থেকে যারা পালিয়ে গেছে, তারাই বেঁচে গেছে! আচ্ছা ডাক্তারকাকা, আমাদের যে সেই জ্যাঠাবাবু ছিল, তিনি নাকি এখনও বেঁচে আছে, বিন্দাবনে আছে, এ কথা সত্যি?

—কি জানি শঙ্কু। মাকে নিয়ে তো কাশী বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম একবার, কই খোঁজ তো পাই নি। কিন্তু শঙ্কু, মুখ্যু হয়ে আছিস বলে কি বংশের সভ্যতা-ভব্যতা একেবারে ভুলে যেতে হয়? জ্যাঠাবাবুকে যে 'আছে' বলতে নেই, 'আছেন' বলতে হয়, একথাও জানিস না তুই?

—কি করে জানব কাকা। এরা সবাই ছোটলোক, এদের সঙ্গেই তো মানুষ হলাম। এরা মাকে বলে 'তুই'—

—থাক শঙ্কু।

—তোমার মা তো আমাদের ঠাকুমা হয় কাকা, তাই না?

দিদিরা ছেলেবেলায় গল্প করতো। কত গল্প! বলতো ঠাকুমা ছিল, পিসি ছিল, কাকা ছিল, মা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই পাপেই—

—না শঙ্কু, এটা তোমার ভুল ধারণা! কেউ তাড়িয়ে দেয় নি। আমার মা নিজেই চলে গিয়েছিলেন। তখন তো তোমার বাবাও ছিলেন, জ্যাঠাবাবুও ছিলেন। মা বলেছিলেন—মানুষ হতে হলে তার প্রথম কথা হচ্ছে পরের অন্ন আর পরের আশ্রয়ের লোভ ত্যাগ করা। দুঃখু কষ্ট অভাব অসুবিধে সব কিছুর সঙ্গে যুদ্ধু করে জিততে পারলে তবেই মানুষ হওয়ার কথা মুখে আনতে হয়। কিন্তু তোদের কথা আলাদা। তোদের নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি অন্যে বে-দখল করে বসেছিল—

—জানো কাকা, পাগল হয়ে গিয়ে মা খালি চেঁচাতো, ওরে ত্রিভুবনে কেউ কখনও যেন বড়মানুষ না হয়। টাকাই পাপ, টাকাই অলক্ষ্মী, টাকাই সর্বনাশের গুরু।

—ওটা উনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তাই বলতেন শঙ্কু, টাকা পাপ নয়, টাকাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার ইচ্ছেটাই পাপ। ওই টাকাকে নিয়ে তুমি মন্দির বানাও, ইস্কুল খুলে দাও, গরীবের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, দুঃখী দুঃস্থ প্রতিপালন করো, তখন টাকাই পুণ্য, টাকাই লক্ষ্মী। হ্যাঁরে শঙ্কু, বাড়িতে যে পূজো হতো, সে আর হয় না?

—নাঃ! বাবা মারা যাবার পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। মা তো তখন—

—কিরে শঙ্কু? হঠাৎ অমন থামলি যে? মা তখনই পাগল হয়ে গিয়েছিল?

—তা একরকম তাই কাকা। কিন্তু যাক, মা গুরুজন, স্বর্গে গেছেন। মার কথায় কাজ নেই। আচ্ছা কাকা, এ বাড়ির তলায় তলায় পাতালঘর আছে, চোরা সিঁড়ি আছে, এ কথা কি সত্যি?

—সত্যি শঙ্কু। আর পাপ সেই চোরা পথেই নিজেকে বিস্তার করেছে, সেই চোরা ঘরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তোকে

কে বললে এসব কথা ? এ সব তো লুকোনো কথা।

—দিদিরা চুপিচুপি বলতো। ওই ঘরে নাকি আমাদের জ্যাঠিমা পচে মরে পড়ে ছিল। পরে মেসোমশাই যখন মালিক হল, তখন নাকি রাতারাতি মিস্তিরি ডেকে সব দরজা বুজিয়ে দিয়েছে। মেসোমশাইয়ের নাকি ভয় করতো। বলতো ওর মধ্যে ভূত আছে। রাত্তিরে তারা উঠে আসে। সে দরজা আর খোলানো যায় না ডাক্তারকাকা ?

—কেন শঙ্কু, সে দরজা আর খোলানোর দরকার কি ?

—আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। বাগানে যে গোলঘরটা আছে, তার নীচেই নাকি পাতালঘরের সিঁড়ির মুখ। বুজিয়ে দিয়ে তার ওপর বেদী গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তুমি খোলাতে পার না ডাক্তারকাকা ?

—না শঙ্কু! যা চাপা পড়েছে তা চাপাই থাক। হেমন্ত ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলে বলে—ইচ্ছে আমারও করে রে শঙ্কু। কিন্তু সব ইচ্ছেই কি পূরণের চেষ্টা করতে আছে ? তবে হ্যাঁ, ভাল হোক, মন্দ হোক, একটা ইচ্ছে আমি তোর কাছে ব্যক্ত করব। ও ঘরের দেয়ালে উঁচুতে বড় বৌরাণীর, মানে তোর জ্যাঠাইমার যে মস্ত ছবিখানা টাঙানো আছে, ওই ছবিখানা আমি নেব। এইটা তোর কাছে আমি চাইছি।

—তুমি আমার কাছে চাইছ ডাক্তারকাকা ? এ বাড়ির সব কিছুই তো তোমার। এরা পর হয়েও সব দখল করে আমাকে চাকরের মত করে রেখে দিয়েছিল, তুমিই তো বাঁচালে। তুমি যা ইচ্ছে তাই নাও না।

—আর কোন কিছু নেবার ইচ্ছে আমার নেই শঙ্কু। হেমন্ত ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে বলে—সাহেববাড়ির ফটোগ্রাফার দিয়ে তোলা ছবি, আমিই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তুলিয়ে দিয়েছিলাম। বড্ড শখ হয়েছিল ওঁর। বাবাঃ সে কত কাণ্ড করে যাওয়া! ছবি দেখে বড়দাদা খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন—'আমারও একটা ফটো ছবি করে দিস

হেমন্ত, ওই অয়েল পেন্টিংগুলো আর ভাল লাগে না।' তা সে আর সময় হল না। এ বাড়ির সব কিছুই তো বদলানো হয়েছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে, ছবিটা যে বড় রয়ে গেছে ?

—সুন্দর দেখতে বলে। রাজমোহনদা বন্ধুদের ডেকে ডেকে গৌরব করতো—দেখেছিস আমাদের ঘরের মা মাসীর কত রূপ! বাইজীরা হার মানে।

—থাম শঙ্কু। ছিঃ! সত্যিই ইতরের সঙ্গে মিশে ইতর হয়ে গেছিস তুই। মা মাসীদের নিয়ে ওকথা বলতে নেই, তাও জানিস না ?

—কিন্তু ডাক্তারকাকা, তাঁদের ওপর ভক্তি-ছেদ্দা ঘুচে যায় এমন কাজ যদি তাঁরা করেন ?

—তবু ভক্তি রাখতে চেষ্টা করবি শঙ্কু। মনে জানবি অশিক্ষা কুশিক্ষা আর চারদিকের আবহাওয়া ভাল ভাল মানুষকেও মন্দ করে তুলতে পারে। তাই বিচার করা বড় শক্ত। আবার ছাখ মানুষ খুন করা তো মহাপাপ ? কিন্তু জায়গা বিশেষে হয়তো কেউ তেমন কাজও করে ফেলে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকতে পারেন। মদ যারা খায়, তারা আর কতটুকু পাপী ? কতবড় পাপী তারা বল তো—যারা ওই মদ বানায়, লোকের সর্বনাশ করতে দোকান সাজিয়ে বসে থাকে ? অথচ তাদের নিন্দে নেই, শাস্তি নেই।

অন্যমনস্ক হয়ে যায় হেমন্ত। ভবানীশঙ্করের ছেলে শঙ্কুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যায় কোন্ দূর অতীতে।

নিন্দে, সুখ্যাতি, এর সীমারেখাটা কি ?

চারুহাসিনী মুখ্যু, চারুহাসিনী নেহাৎ বাজে।

কিন্তু হেমন্ত তো বিদ্বান্ হয়েছিল, হেমন্ত তো নিজেকে বাজে ভাবে না ? তবে ? ভবানীশঙ্কর যখন ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল, হেমন্ত কি খবর পায় নি ! তবু একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারল কি করে ? হেমন্তর কি উচিত ছিল না অন্ততঃ আত্মীয় সম্পর্কের নীতি নিয়েও একবার এসে দাঁড়ানো ?

ওরা চুলোয় যাক্, ওদের যা হয় হোক, একথা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল কেন হেমন্ত? হেমন্ত কি জানত না, চারুহাসিনীর বুদ্ধির পরিমাণ কি? জানত না ছোড়দার ছেলেরা নাবালক? জানত, তবু হেমন্ত শুধু অন্নপাপ ধুয়ে ফেলবার সাধনাতেই নিমগ্ন ছিল, অন্নঋণের কথা চিন্তা করতে একেবারে ভুলে গিয়ে।

সে ঋণ কি শোধ হয়?

হেমন্তদের পিতৃবংশে কবে কে ছিল?

কেউ না কেউ না!

এরা দূর আত্মীয়। মাতৃকুলের।

তবু এরা তো হেমন্তকে চাকরের মত রাখে নি। রাখলেই রাখতে পারতো। ওই শঙ্কুর মত ছেঁড়া ফতুয়া পরে ফরমাশ খেটে বেড়াতো হেমন্ত মামাতো দাদাদের।

প্রভাবতী অবিরত দে চৌধুরীদের 'পাপ'কেই দেখেছেন, মহত্ত্বকে দেখেন নি। আজ শঙ্কুকে দেখে সেই মহত্ত্বটুকু অনুধাবন করতে পারছে হেমন্ত। শুধু অন্নঋণ নয়, শিক্ষাঋণের কথাটাও ভুললে চলবে না। যে ঋণ অন্নঋণের চাইতে অনেক বড়। অন্ন তো লোকে পোষা কুকুরটাকেও দেয়।

হেমন্ত যে ভাবতে শিখেছে, ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছে, ভদ্র হয়েছে সভ্য হয়েছে, এর মূলে কি দে চৌধুরীদের মহত্ত্ব নেই?

প্রভাবতী এত বোঝেন, এটা বুঝতে চান না। উল্টে তিনি ছেলেকে সন্দেহ করেন। বলেন,—জানি জানি, ওদের ওপর তোর টান আমার অজানা নয়।

এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছিলেন প্রভাবতী ছেলেকে। তবু সন্দেহ করতেন লুকিয়ে বোধ হয় যায় হেমন্ত। কতদিন আচমকা এমন এক একটা প্রশ্ন করে বসেছেন, যাতে মুখ লাল হয়ে উঠেছে হেমন্তর।

তবু মাকে কখনও কিছু বলতে পারে নি হেমন্ত। মাকে সমীহ করে চলেছে।

সমীহ। আর কিছু নয়?

ভাবল হেমন্ত।

আর কিছু খুঁজে পেল না। সমস্ত ভালবাসা তার যেন গভীর একটা শূন্যতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। সেই স্তব্ধতার দিকে তাকাতে সাহস হয় না হেমন্তর।

সে ভালবাসার চেহারাটা কি, জানা নেই হেমন্তর।

সে কি মায়ের স্নেহ?

বোনের প্রীতি?

বন্ধুর ভালবাসা?

প্রিয়ার প্রেম?

জানে না।

বিশ্লেষণ করে দেখে নি কোনদিন। শুধু সমস্ত ভালবাসার সঞ্চয়খানি তার একটি কেন্দ্রে স্থির হয়ে পড়ে আছে।

সে রাত্রে এ বাড়িতে ডাক্তার হয়ে এসেছিল কি হেমন্ত জেনে বুঝে?

না। হেমন্ত জানত না।

যে ডাকতে গিয়েছিল সে পাগলের মত খানিকটা হাউমাউ করেছিল, আর তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিল।

গাড়ি নিয়ে এসেছিল, তাই কোথায় কি বৃত্তান্ত এ নিয়ে আর বেশী প্রশ্ন করে নি হেমন্ত তাকে।

প্রভাবতী বলেছিলেন,—জানা নেই শোনা নেই হঠাৎ রাতদুপুরে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে—

হেমন্ত হেসেছিল, ডাক্তার কি কেবল জানা-চেনা বাড়িতেই যাবে মা?

—কিন্তু এত রাত্তিরে—

—রোগ কি আর দিন রাত মানে মা?

—কি জানি আমার কেমন ভাল ঠেকছে না। গা ছম্‌ছম করছে।

মনে হচ্ছে বিপদে পড়বি।

—কী আশ্চর্য, এসব বলছ কেন ?

—কি জানি! নিশ্বাস ফেলেছিলেন প্রভাবতী,—চিরদিন ভয় নিয়ে ঘর করে করে ভয়টাই স্বভাব হয়ে গেছে। চিরদিন মনে হতো কে কোথায় বসে ষড়যন্ত্র করছে তোকে বিপদে ফেলার জন্যে, আজও সে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারি না।

—কেন ভাবছ ? এই যাব আর আসব। গাড়ি রয়েছে।

—রুগী মেয়েমানুষ, না বেটাছেলে ?

—ছেলে ছেলে!

—তবু ভাল।

আর কথার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল।

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট শব্দটা কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তুলেছিল হেমন্তকে, পথ সম্বন্ধে সচেতন হবার কথা মনে পড়ে নি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে চমকে গিয়েছিল। পাশের লোকটাকে প্রশ্ন করেছিল—কাদের বাড়ি ?

বাড়ি আজ্ঞে জীবনবাবুর। তা তিনি তো মারা গেছেন, এখন কর্তা হচ্ছে তাঁর ভাইপো রাজমোহনবাবু। তারই অসুখ।

—রাজমোহন! রাজমোহন কি ?

—আজ্ঞে মিত্তির।

রাজমোহন মিত্তির!

কে সে ?

এ পাড়ায় কোথায় বাড়ি করেছে ?

কবে ? জীবনবাবু কে ?

অনেকগুলো উঁচোনো প্রশ্নের ওপর থাবা বসিয়ে গাড়ি দে চৌধুরীদের বাড়ির সামনে থমকে থেমে গেল।

ডাক্তার রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল,—এ কোথায় থামলে ? এ বাড়ি দে চৌধুরীদের না ?

—আজ্ঞে আগে তাদেরই ছিল, এখন মিত্তিরদের হাতে চলে এসেছে। চিনতেন বুঝি তাদের ?

চিনতেন।

হেমন্তকে জিজ্ঞেস করছে দে চৌধুরীদের চিনত কি না।

একবার কি ভেবেছিল হেমন্ত, বলবে, যাব না। গাড়ি ঘোরাও।

চকিতে একবার ভেবেছিল বুঝি।

তারপর তার চিকিৎসক সত্তা সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাগ্রস্ত এক রোগীকে দেখতে এসেছে সে। হৃদয় নিয়ে বিলাস সাজে না।

আর ?

আরও গভীরে ?

অনেক স্তরের তলায় তলিয়ে থাকা মনে ? এতটুকু লোভ কি উল্লসিত হয়ে ওঠে নি সেখানে ?

দে চৌধুরীদের এই অভিশপ্ত ইটকাঠগুলো কি সহস্র বাহু দিয়ে অবিরত আকর্ষণ করে না হেমন্তকে ? আজ যদি এক অদ্ভুত পথে সেই আকর্ষণে ধরা দেবার সুখ জুটে গিয়ে থাকে, ছাড়বে কি করে ?

একবার যদি সমস্ত বাড়িখানা তন্ন তন্ন করে দেখতে পেতো হেমন্ত! হয়তো হঠাৎ আবিষ্কার করে বসতে পারতো কি হয়েছিল সেই রহস্যময় রাত্তিরে!

কি হয়েছিল! কি হয়েছিল! এ প্রশ্ন অহরহ কুরে খেয়েছে হেমন্তকে।

যেদিন চোরা ঘরের দরজায় ছড়ানো এলোচুলের রাশি দেখে শিউরে রামরাম করে উঠেছিল ওরা, সেদিন সারা বাড়ি ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছিল অন্য এক নতুন সন্দেহে। ভারী জোরালো আর রসালো সেই সন্দেহ।

আর কিছু নয়, গৌরীশঙ্কর!

তা ছাড়া আর কি!

গৌরীশঙ্করের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় ?

হুঁ। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হলে পুরুষের পক্ষে যে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয়!

নিশ্চয় সন্দেহ ঘটেছিল তাঁর মালতীর ওপর।

আর তা ঘটার কারণও ছিল।

টগর নাকি বলেছিল ঘরের ভেতর থেকে—চোরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওই ঠিকেদার মুখপোড়ার সঙ্গে লীলা চালাতেন বড় গিন্নী।

নির্ঘাৎ টের পেয়ে গিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর।

আর তারপর তো অঙ্ক মিলেই যাচ্ছে নির্ভুল। ঘরের মধ্যে থেকে ওই অন্ধকূপের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে মালতীকে, দরজা এঁটে দিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর। তারপর বাইরে গিয়ে আবার অন্দরে দোতলায় উঠে এসে দরজা ভাঙার ছল করে লোক ঠকিয়েছিলেন।

এ ছাড়া আর কিছু নয়।

কুলটা স্ত্রীকে এই রকম ভয়ঙ্কর শাস্তিই দিয়ে থাকে দুঁদে পুরুষেরা।

গৌরীশঙ্কর মমতাশীল?

রেখে দাও। মাতালের আবার মমতা!

বলি কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তবে ওই চোরা সিঁড়ি আর চোরা ঘর বানিয়ে ছিলেন শুনি? ওই—ওই মতলব। যখন যার প্রতি বিরূপ হবেন, গুম খুন করে ফেলবেন তাকে। মহারাণীর আইন টেরও পাবে না।

তা কাজটা করে ফেলে বোধহয় একটু অনুতাপ হয়েছে, তাই অমন মুষড়ে পড়েছেন। কিংবা কে বলতে পারে মালতীর ভূত এসে শাসিয়েছে কি না!

ভূতাচ্ছন্নের মতই তো দেখাচ্ছিল মানুষটাকে কদিন।

গহনাগুলো?

সেও আর কিছু নয়, টগরকে ঘুষ! টগর নিশ্চয় ওই খুনটা টের পেয়েছিল। সর্বদা থাকতো তো সঙ্গে সঙ্গে!

তা মাগীর কপাল মন্দ। তাই বাঘা ভূতোর কবলে পড়ে গেছল।

ব্যাস সব হিসেব মিলে গেল।

আর প্রশ্নের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে না!

ওই ক্ষতবিক্ষত হবার ভয়েই তো লোকে অপরের সম্পর্কে এত অঙ্ক কষে। কি জানি বুঝছি না কি ব্যাপার! বলে চুপ করে থাকা সম্ভব না কি? বুদ্ধি নেই মানুষের? নেই, সে বুদ্ধির অহঙ্কার?

সেই বুদ্ধির অহঙ্কারটাই সেদিন ফিসফিসিয়ে উঠেছিল দে চৌধুরীদের অন্দরে।

আর সেই ফিসফিসিনির মধ্যে থেকেই চলে আসতে হয়েছিল হেমন্তকে। অতবড় একটা রহস্য উদ্‌ঘাটনের মুহূর্তেও প্রভাবতী এক তিল দাঁড়ান নি। থামান নি উদ্যত যাত্রাকে।

হেমন্ত থমকাচ্ছিল।

হেমন্ত সেই গলিত শবের পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রভাবতী কটুকণ্ঠে বলেছিলেন,—তুমি যাবে? না কি, এই রাজপ্রাসাদেই থাকবে?

প্রভাবতীর ভিতরটা কি পাষাণ হয়ে গিয়েছিল?

আগুন লাগা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার সময় বুঝি এমনি পাষাণই হয়ে যায় মানুষ।

হেমন্তর অন্যমনস্কতার মাঝখানে শঙ্কু উঠে গিয়ে কোথা থেকে একখানা ফার্স্ট বুক নিয়ে এসে বলে,—আচ্ছা কাকা, জ্যাঠাইমার কি নাম ছিল জানো?

—জানি। কেন, নামে কি হবে?

—কিছু না। এই বইটায় লেখা আছে মালতী। এ নাম জ্যাঠাইমার?

—হ্যাঁ।

—আর এই হাতের লেখাটা? জ্যাঠাইমার?

—কি জানি!

মিছে কথা বলল হেমন্ত।

বলল—কি জানি।

নিজের হাতের লেখা চেনে না হেমন্ত?

বইটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে হেমন্ত। জ্যাঠাইমা সম্পর্কে শঙ্কুর অশেষ কৌতূহল। তাই আবার বলে—জ্যাঠাইমা ইংরিজি জানতেন?

—শিখেছিলেন।

—আমার জ্যাঠাইমার সব কথা জানতে ইচ্ছে হয়।

—কেন রে শঙ্কু?

—কি জানি। মনে হয় একমাত্তর উনিই বোধহয় ভাল লোক ছিলেন দে চৌধুরীদের বাড়িতে।

হেমন্ত চমকে উঠে বলে—একথা কেন মনে হয় তোর শঙ্কু?

—কি জানি ডাক্তারকাকা। বোধহয় ওই ছবির মুখ দেখে। কী চমৎকার সরস্বতী ঠাকরুণের মতন মুখ, কী সুন্দর চেহারা! দিদিরা বলতো, মার মতন পাজি ছিলেন না জ্যাঠাইমা—

—ছিঃ শঙ্কু! আবার? মার সম্বন্ধে ও কি কথা?

শঙ্কু অপ্রতিভ হয়ে যায়।

চুপ করে যায়।

কিন্তু কতক্ষণ চুপ করে থাকবে?

মনের মধ্যে যে তার প্রশ্নের সমুদ্র। সেই অশেষ প্রশ্ন নিয়ে চুপ হয়ে থেকে এসেছে সে এতদিন। আজ যদি হাতের কাছে পেয়েছে এমন এক উত্তরদাতা।—আচ্ছা কাকা, জ্যাঠাইমা নাকি ওই চোরা সিঁড়ি দিয়ে কোথায় যেতে গিয়ে আটকা পড়ে পচে পচে মরেছিলেন। কোথায় যাচ্ছিলেন, জানো তুমি?

—ও কথা থাক শঙ্কু, এতদিন পরে ওকথায় কি দরকার?

—কি জানো কাকা, এই বাড়িটার ওই দখল নাকি, সেই পাওয়া পর্যন্ত আমার ভারী একটা মুশকিল হয়েছে।

—কি রে, কি মুশকিল!

—রাস্তায় বেরোলেই একটা লোক সঙ্গ ধরে, আর খালিখালি বলে, 'এ বাড়ি ছাড়্। এ বাড়ি মন্দির বানিয়ে দে। এই অভিশাপের বাড়ি ভোগ করতে চাইলে বাঁচবি না, মরবি। মন্দির বানিয়ে দিয়ে নাম দে—' কিন্তু জ্যাঠাইমার নাম তো বলে না। আমি ভাবতাম জ্যাঠাইমার নাম। কিন্তু বইতে তো লেখা রয়েছে—মালতী।

—হ্যাঁ মালতী।

—আচ্ছা তবে 'পুণ্যলক্ষ্মী' কার নাম?

—পুণ্যলক্ষ্মী! জানি না তো। এ বাড়ির কারুর নাম নয়। কি ব্যাপার বল্ তো? এ নামে কি হয়েছে?

—লোকটা বলে—'মন্দির বানিয়ে নাম দে, পুণ্যলক্ষ্মী স্মৃতিমন্দির। বলে, যার হকের ধন নিয়ে বাস করছিস, তার নামটা বজায় রাখ্।'

হেমন্ত অবাক হয়ে যায়। হকের ধন! কার হকের ধন? সে তো জানে না পুণ্যলক্ষ্মী বলে কে ছিল।

না, সে জানে না এই অট্টালিকা, এই ঐশ্বর্য সবই পুণ্যলক্ষ্মীর হতে পারতো। যোগেশ্বরের স্বপ্ন ছিল এমনি একখানি বাড়ি, আর সাধ ছিল সে বাড়ির অধীশ্বরী করে রাখা পুণ্যলক্ষ্মীকে। সব স্বপ্ন ভেঙে গেল, নরকের শয়তান হয়ে উঠল যোগেশ্বর। কল্পনায় বাড়িটাকে গড়ে তুলল বটে আর একজনের মাধ্যমে কিন্তু সে বাড়িকে পাপে ভরিয়ে তুলল শুধু প্রতিহিংসা সাধন করতে।

এসব কথা কেমন করে জানবে হেমন্ত? তাই ভেবে বিপদে পড়ল। তারপর বলল—খুব সম্ভব কোনও পাগল।

কালীশঙ্কর ভাবল তাই হবে। লোকটা পাগল। গ্রাহ্য করল না আর, কিন্তু তাতে যা হবার তাই হল। টিঁকল না। মুখ্যু গাধা ছ-পাঁচ বছরও টিঁকল না, সাবালক আর হতে হল না তাকে। বাগানের পুকুরে চান করতে গিয়ে ডুবল আর উঠল না। ভোগ হয় না, এ বাড়ি কারুর ভোগে আসবে না। প্রতিশোধের অভিশাপে এর প্রত্যেকটি ইট জর-জর। যে ঢুকবে সেই মরবে—ধ্বংস হয়ে যাবে।

হঠাৎ আমার চেতনা এল। চীৎকার করে উঠলাম,—কে কে? কে আপনি? গল্প বলার নাম করে কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমাদের? কী স্বার্থ এতে আপনার?

মোহাচ্ছন্নের মত বসেছিলাম এতক্ষণ। ও যেন আমাদের উপর মন্ত্র প্রয়োগ করেছিল, আর আমরা নীরবে একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনছিলাম বসে বসে। চেতনা এল—বাস্তবিক তো, এ তো রীতিমত ভয় দেখানো। ভয় দেখিয়ে ও আমাদের উচ্ছেদ করতে চায় নাকি? নিশ্চয় কোন স্বার্থসিদ্ধি আছে ওর তাতে। তাই একটা গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদে—! বলে উঠলাম—থাক আপনার কাহিনী। আর শুনতে চাই না আমরা।

—ভুল করলেন—ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আপনাদের হিত করতেই চাইছিলাম। এ বাড়ি ভোগ হবে না জানা কথা। তার চাইতে ইস্কুল করে দিন না বাড়িটা। মেয়ে-ইস্কুল। এ অঞ্চলে মেয়ে-ইস্কুল নেই। মন্দিরের চেয়ে ইস্কুল দরকারি।

ওঃ তাই। এতক্ষণে এই আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা আর এই ভয় দেখানোর মানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। স্কুল সম্পর্কে স্বার্থসম্পন্ন কোন লোক, বাড়িটাকে হানাবাড়ি প্রতিপন্ন করে দখল করতে চায়। তীব্রস্বরে বলে উঠি—পয়সা দিয়ে বাড়ি কিনে ইস্কুল খুলে দেব, এত মহানুভব আমি নই মশাই। এতক্ষণে চিনেছি আপনাকে—

—চিনেছেন আমাকে। হাঃ হাঃ হাঃ! সেই ভৌতিক হাসিতে রাত্রির স্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে ফেলে ভদ্রলোক বলেন—চেনা এত সহজ বুঝি? অত সোজা নয়। বুঝলেন? অত সোজা নয়। সৎ পরামর্শই দিতে এসেছিলাম—বাঁচাতে এসেছিলাম—

আমি বলি—থাক মশাই থাক। এতগুলো বছর যখন আপনার সৎ পরামর্শ ব্যতীতই বেঁচে থেকেছি, তখন বাকি বছরগুলোও পারব। আপনি দয়া করে আমায় রেহাই দিন।

—দয়া! দয়া! যোগেশ্বর সামন্ত আজ পর্যন্ত কখনও কাউকে দয়া

করেছে দেখলেন ? হা হা হা !…হা হা হা !

—কী ! কী বললেন ! কে ! কে আপনি ! আমার আর বর্ষার যুগপৎ আর্তনাদের সঙ্গে বামুন-মেয়ে আর চাকর ছোকরার আর্তনাদ মিশে গেল। কারণ সেই মুহূর্তে সারা বাড়ির আলো ফিউজড্ হয়ে গেছে।

॥ আটাশ ॥

অন্ধকার ! নীরন্ধ্র অন্ধকার !

হঠাৎ আলো নিভে গেলে বুঝি অন্ধকারটা এমনি জমাট পাথরই হয়ে ওঠে। সয়ে নিতে সময় লাগে। সেই চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, চেঁচিয়ে উঠি—বর্ষা ! কোনদিকে গেলে তুমি ?

বর্ষার সাড়া পাই না। এমন নিশ্চুপ হয়ে গেল কেন সে ? ওর কোনো সাড়া নেই, শুধু মনে হয় অনেকগুলো গলা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল, অনেকগুলো পায়ের শব্দ খস্‌খসিয়ে উঠল, নাম-না-জানা কী যেন একটা গন্ধতেলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারের বাতাসে, আর কতক্ষণ যেন পরে সহসা তীব্র তীক্ষ্ণ একটা স্বর সমস্ত পরিবেশটাকে খান খান করে দিয়ে চীৎকার করে উঠল,—টগর ! টগর ! কোথায় গেলি তুই ?

এ কথা কে কয়ে উঠল ?

এ গলা কার ?

এ স্বর কি আগে কখনও শুনেছি আমি ? বর্ষার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কি আদল আছে এর ?

এই গন্ধতেল বর্ষা কবে মাথায় মেখেছে ?

জ্ঞান রয়েছে, অথচ হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন অবস্থা এসেছে কখনও কারুর ?

জানি না।

জানি না এমন অবস্থা আর কখনও কারো এসেছে কিনা। শুধু সেই মুহূর্তে বুঝি সেই অবস্থাটাই ঘটেছিল আমার।

মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড নিথর হয়ে গেছে, থেমে গেছে নিশ্বাস প্রশ্বাস, কথা কইবার শক্তি অবলুপ্ত। অথচ অনুভব করতে পারছি যেমন করে হোক প্রদীপ মোমবাতি যা হোক কিছু আলো একটা জ্বালা উচিত।

উচিত চাকরটাকে কি বামুন মেয়েকে ডাক দেওয়া। বর্ষা উদ্‌ভ্রান্তের মত কোন্ দিকে ছিটকে গেল, অথবা মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেল, তার তল্লাস করা। বুঝতে পারছি এসব করতে হবে। কিন্তু গলা দিয়ে যদি স্বর না ফোটে? হাত পা নাড়াবার ক্ষমতা যদি না হয়?

কতক্ষণ এমন অবস্থায় ছিলাম আমি?

এক মিনিট?

এক ঘণ্টা?

না, লক্ষ যুগ?

সেই লক্ষ যুগের সমাধি থেকে জেগে উঠলাম কখন?

যখন বর্ষা এসে ব্যাকুল আবেগে প্রায় আমার গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল?

কিন্তু সে কি বর্ষা!

সহজ সুস্থ প্রকৃতিস্থ সেই মানুষটা? যে মানুষ এই কিছুক্ষণ আগেও উদগ্র কৌতূহলে বারবার বলছিল, তা হোক্ আপনি বলুন? বলুন মালতীর কি হল? গল্পের শেষটা বলুন?

কোথায় সেই স্বাভাবিক মানুষটা?

একটা বিদঘুটে গল্প শুনে বর্ষা কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল? নইলে এই চারিদিকের দরজা জানলা খোলা, দক্ষিণের বারান্দা থেকে বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঘরে দাঁড়িয়ে ও কেন ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করছে,—দরজাটা খুলে দাও না, বাতাস পাচ্ছি না যে! দম আটকে আসছে—

হ্যাঁ, দাঁড়িয়েই আছে বর্ষা আমাকে শক্ত করে ধরে। বসবে না।

প্রাণপণ চেষ্টা করছি ওকে বসাবার জন্যে, পারছি না। এত জোর এল কি করে বর্ষার গায়ে ?

কথা বলতে পেরে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিলাম—বামুন মেয়ে! বামুন মেয়ে! তুলাল! তুলাল! কোন সাড়া পাইনি।

ওই ভৌতিক লোকটার মত ওরাও কি উপে গেল? বাতাসে মিলিয়ে গেল? আলো নিভে যাওয়ার পর একবার মাত্র ওদের গলা শুনেছিলাম। আকস্মিকতার আঘাত-খাওয়া মূঢ় আর্তনাদ।

হঠাৎ ইলেকট্রিক ফিউজ্‌ড্‌ হয়ে গেলে এমন আর্তনাদ তো ওঠেই। ঘরে পথে।

কিন্তু তারপর ?

মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়ে রইল কোথায় ত্র-ত্রটো মানুষ? এত ভয় পেল তারা? কিন্তু ওদের কারুর সাহায্য ব্যতীত আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করব কি করে? বর্ষা তো আমাকে শক্ত করে ধরে রয়েছে।

আর বর্ষার খোঁপা থেকে চামেলি ফুলের মত একটা উগ্র মধুর গন্ধ উঠে আমার চৈতন্যকে যেন দিশেহারা করে তুলছে।

বর্ষার তো খোঁপায় মালা পরা অভ্যাস নেই। বর্ষা তো জীবনে কখনও এ তেল মাখে না।

আলোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠছি।

অনেক চেষ্টায় যে মানুষটাকে মাটিতে বসাতে পেরেছি, তাকে স্পষ্ট দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছি, কিন্তু কোথায় আলো? কে জ্বালবে?

না, সারা রাতে আলো আর জ্বলল না। সারারাত বর্ষা আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল আর উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগল—ওই শুনছো? দেয়ালের মধ্যে থেকে কে কাঁদছে! মাটিতে কান পেতে দেখো, মাটি থেকে কান্না উঠছে! বলতে শুরু করল—দেখো, আমি পষ্ট শুনলাম, কে যেন আকুল হয়ে কাকে ডাকছে!

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা বৃথা, কারণ আমিও কোন ডাক না হোক অবিরত শুনতে পাচ্ছিলাম কে কোথায় বাসন-পত্র নাড়ছে,

স্যুটকেস টানছে, ধুপ্‌ ধুপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে উঠছে। হঠাৎ আচমকা খুলে গেল জানলাগুলো, বাতাস এসে আছড়ে পড়ল। অথচ এই কদিনে এসব কিছুই অনুভব করি নি।...

লোকটা কি অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে গেল? না, অন্ধকারটা ওরই কারসাজি? পালিয়ে যাবার সুযোগ করতে? কিন্তু ও তো বসেই ছিল।....সমস্ত রাত একটা বিশ্রী অবস্থায় কাটিয়ে সকালের আলো চোখে এসে লাগল। দেখলাম বর্ষা ঘুমিয়ে পড়েছে। সমস্ত আতঙ্ক হঠাৎ ভারী হাস্যকর মনে হল। নীচে নেমে এলাম। দেখলাম বাইরের দরজা হাঁ করে খোলা।

অন্ধকারের সুযোগে শুধু যে সেই রহস্যময় লোকটাই অন্তর্ধান করেছে তাই নয়, চাকরটি এবং বামুন মেয়েটিও অন্তর্ধান করেছে তাদের মাল মোট গুছিয়ে নিয়ে। তার সঙ্গে আমার সংসারের মাল মোটও বেশ কিছু। অর্থাৎ রাত্রের সেই বহুবিচিত্র শব্দতরঙ্গের জন্য দায়ী ওরাই। বুঝতে অসুবিধে হল না, কাহিনীর মর্ম ওরা বুঝুক না বুঝুক, ওই বদ্‌ লোকটার ভুতুড়ে হাসিই ওদের চাকরীছাড়া করেছে। আর, চলেই যখন যাচ্ছে—তখন—।

॥ উনত্রিশ ॥

আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটছে। মৃদু উষা প্রখর সকালের মূর্তি নিচ্ছে।

সংসারের কি কি গেছে, কতটা লোকসান হয়েছে তাই পরীক্ষা করতে এঘর ওঘর করছি।

হঠাৎ সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি।

বর্ষা জেগে গেছে তা হলে। আর জেগে উঠে আমাকে না দেখে—

হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখতে না পেয়ে ছুটেই এসেছে বর্ষা। অভিমান আর অভিযোগে ছলছলিয়ে বলে ওঠে সে—আমায়

একলা ফেলে চলে এসেছ তুমি ?

সান্ত্বনা দিয়ে বলি—চলে আসা আবার কি ? তোমার সাধের চাকরটি আর বামুন মেয়েটি কি কি উপকার করে গেছেন আমাদের, তাই দেখছিলাম।

বর্ষা বেশ একটুক্ষণ যেন অবাক হয়ে বলে—বামুন মেয়ের কথা কী বললে ?

তা অবাক অবশ্য হবারই কথা। ওরা যে এ রকম করবে, করতে পারবে এ তো ধারণার অতীত। বেচারী শক্ পাবে। কিন্তু না বলেও তো উপায় নেই। তাই যতটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বলি,—বলছি আর কি! ওরা দুজন তো রাত্রের সেই অন্ধকারের সুযোগে হাওয়া! জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আবার শুধু নিজেদের জিনিসই নয়, মনে হচ্ছে আমাদেরও বেশ কিছু—

একটু হেসেই কথাটার উপসংহার করি।

কিন্তু বর্ষা এহেন সংবাদেও খুব একটা চমকে ওঠে না। আশ্চর্যই হয় না। কেমন একটা উদাস উদাস ভাবে বলে—তা কী করেই বা থাকবে ওরা ? এত পাপের মধ্যে কি থাকতে পারে মানুষ ?

—পাপ! পাপ কিসের ?

আমি একটু ধমকের মত করেই বলি কথাটা। ওর চোখ মুখ থেকে গত রাত্রির বিহ্বলতা যেন কাটেনি এখনও। সেটা কাটাতে হবে। আমার বুদ্ধিতে বলল, এক্ষেত্রে এ রকম একটু ধমকের দরকার। বিহ্বল ভাবটা কাটবে হয়তো তাতে।

তা কাজ বোধ হয় হল একটু।

বর্ষা রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল,—বকছ কেন ?

—বকছি কই ? তুমি ওই পাপটাপ বলছ কেন ? মাথা থেকে ঘুমের ঘোর কাটেনি বুঝি ?

—খুব ঘুমিয়েছিলাম আমি না ?

বর্ষা প্রশ্ন করল।

উত্তর দিই—খুব নয় কিছু। এই শেষ রাতের দিকে একটু—

—একটু। আশ্চর্য। কত যে স্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল সব সত্যি।

হেসে ওঠার ভান করে বলি—স্বপ্ন যখন দেখে লোকে, তখন সেটা সত্যি বলেই ভাবে।

বর্ষা উদাস ভাবে বলে—তা হবে।

ওর এই অন্যমনস্কতাটা যাচ্ছে না দেখছি। শক্‌টা লাগানোই দরকার। বললাম—আর কেন, এবার সংসারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমার ডান হাত বাঁ হাত দুটিই তো নিরুদ্দেশ। কিন্তু কী নেমকহারাম দেখ? গেলি গেলি, আমাদের বাসনপত্র ট্রাঙ্ক স্যুটকেস নিয়ে গেলি কি বলে?

এবার বুঝি অন্যমনস্কতা কাটে বর্ষার।

ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বলে,—ওদের দোষ কি?

—বাঃ! দোষ নেই? চুরি করবে ওরা, আর দোষ হবে বুঝি আমার?

—ওরা চুরি করে নি।

—তা ভাল। উড়েই গেল জিনিসগুলো।

—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—বর্ষা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—কত জিনিসই তো উড়ে যায়।

—তা সত্যি। কালকের সেই লোকটাই তো যেন উড়ে গেল!

বর্ষার মুখটা সাদাটে দেখায়।

আমার খুব কাছে সরে এসে মলিন গলায় বলে—ওর কথা থাক। আমার ভয় করছে!

বর্ষার পিঠে একটু হাতের স্পর্শ রেখে বলি—ভয় না করাটাই তো আশ্চর্য। ভয় যাতে লাগে, ভীষণ রকম লাগে, তার জন্যেই তো ওই ভয়ঙ্কর গাঁজাখুরি গল্পটা আমাদের কানে ঢেলে গেল লোকটা।

—গাঁজাখুরি! গল্প!

—তবে না তো কি?—এই এক ধরনের লোক থাকে—বললাম বর্ষাকে—যারা গেরস্তকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কোন একটা বাড়িকে

হানাবাড়িতে পরিণত করে। স্বার্থেও করে, মজা দেখতেও করে। আমার বিশ্বাস স্রেফ্ একটা গাঁজাখুরি গল্প বানিয়েই বলে গেল লোকটা। কিন্তু বলতেই হবে লোকটার সাহিত্য-প্রতিভা আছে। ওই যে বলেছিল আগে লেখার শখ ছিল, সেটা মিথ্যে নয়।

বললাম বটে, কিন্তু বর্ষার কাছ থেকে কোন সাড়া এল না। কেমন একরকম শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ও বলল—দেখো, আমার মনে হচ্ছে কে যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমি হাঁটলে হাঁটছে, আমি দাঁড়ালে দাঁড়াচ্ছে।

আমি রেগে উঠে বললাম—শুধু এই? আর খোনা খোনা গলায় কথা বলছে না? লাল পাড় শাড়ি পরে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে না?

—লালপাড় নয়—বর্ষা আস্তে আস্তে বলল—খয়ের রঙা ঢাকাই শাড়ি।

ভয় আমারও করছে। সারারাত্রির আতঙ্কে ও যেন কেমন জবুথবু হয়ে গেছে। বিপদ সহজ নয়, এর উপর আবার বাড়ির কাজ করার লোক ছুটি গেল। ভেবে-চিন্তে বললাম—বর্ষা, আমায় তো বেরোতে হবে। তোমার মাকে নিয়ে আসি, কি বলো? তোমারও ভাল লাগবে, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোব।

—না না, তুমি আজ আর কোথাও যেও না। বর্ষা শিউরে উঠল।

আমি বললাম—কি করি বলো, কাজ তো কথা শোনে না? বেজায় কাজ পড়েছে। আজ না বেরোলেই নয়:

—তুমি বেরোলে আমি মরে যাব।

—পাগলামী কোরো না বর্ষা। কালীঘাটে যাচ্ছি তোমার মাকে আনতে।

এবার একটু সহজ কথা কয় বর্ষা। বলে—মা কি করে আসবেন, বৌদি নার্সিং হোমে। বাচ্চাদের কে দেখবে?

—বেশ তো, ও:দের নিয়েই আসুন।

—বাঃ, মা বৌদিকে দেখতে যাবেন না? খাবার পাঠাবেন না? নার্সিং হোমের রান্না বৌদি খেতে পারে না।

—চমৎকার! আজ আমাদের তাহলে হরি মটর?

বর্ষা কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে বলে—তা কেন! আমি রান্না করব।

—না না, থাক। তোমার শরীর ভাল নেই। রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

—তার জন্যে কিছু না। বর্ষা অন্যমনস্কের মত বলে—শুধু ভয় করছে সে যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে? যদি কথা বলে?

বিপদ গনে বলি—তবে চলো তোমাকেই তোমার মার কাছে পৌঁছে দিই। সারাটা দিন তাঁর কাছে থাকলে মন ভাল থাকবে।

প্রস্তাবে রাজী হল বর্ষা। শুধু আমার খাওয়ার জন্যে ভাবছিল, আমি বাইরে খেয়ে নেব শুনে সন্তোষ বোধ করে জামা কাপড় বদলাতে গেল। আমিও স্বস্তি বোধ করলাম।

বাড়িটার নিরাপত্তা? কি আর করা যাবে, চাবি দিয়েই যেতে হবে।

কিন্তু বর্ষা করছে কি? অনেকক্ষণ অবধি বর্ষার তো আর পাত্তাই নেই। বার বার তাগাদা দিচ্ছি, সাড়া পাচ্ছি না। নিজের স্নান-পর্ব পোশাক-পর্ব সেরে ওপরে গিয়ে অবাক! দেখি—বর্ষা তার আলমারীর কপাট হাট করে খুলে রেখে খাটের উপর চুপ করে বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকে—কি হল? প্রশ্ন করতেই হতাশভাবে বলল—দেখো, আমার সেই জরি পাড় জামদানীটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—জামদানী!

'ফুলদানী' শব্দটার অর্থ জানি, কিন্তু জামদানী? অবাক হয়ে বলি—জামদানী কি?

—শাড়ি। জানো না? সেই যেটা সেবার তুমি ঢাকা থেকে আনিয়ে দিলে!

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে আমার। রুদ্ধকণ্ঠে বলি—আমি আবার কবে ঢাকা থেকে শাড়ি আনাতে গেলাম! তুমি ভুল করছ।

—ভুল অমনি করলেই হল? বর্ষা বিরক্ত স্বরে বলে—সেই শাড়ি আনানো নিয়ে কত ঠাট্টা করলে তুমি। আর সেই শাড়িটা যেদিন নতুন পরলাম সেদিন—

বর্ষা মুখ তুলে কেমন একরকম লাজুক হাসি হাসল।

মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে। তবু—বললাম, নিরুপায় হয়েই বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই সেবার। কিন্তু থাক না, সেটা যখন খুঁজে পাচ্ছ না, অন্য একটা কিছু পরে নাও।

বর্ষা মুখ তুলে বলল—অন্য একটা? আচ্ছা। কিন্তু পরে নিয়ে কি করব?

—কেন, কালীঘাটে যাবে।

—কালীঘাটে! কেন বল তো?

—কী আশ্চর্য, এই একটু আগে কথা হল না, তোমার মার কাছে যাবে। তোমার বৌদি নার্সিং হোমে—

বর্ষা এবার যেন কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়। বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ইস! হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম! মনেই পড়ছিল না আমি কে!

—আচ্ছা এখন মনে পড়েছে তো? চলো চলো। যত সব ঝঞ্ঝাট!

মনে ভাবলাম আজ অন্ততঃ কালীঘাটে রেখেই আসব ওকে। বিচলিত আর অস্বাভাবিক ভাবটা কাটুক। আশ্চর্য, বর্ষা এত নার্ভাস তা তো কোনদিন টের পাই নি!

•

সারাদিন নানা কাজে ঘুরতে হল, খেয়েও নিলাম এক ফাঁকে, কিন্তু সবই কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগল। আর সেই গাঁজাখুরি কাহিনীটা যেন ছবি হয়ে মানুষ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল। বুঝলাম বর্ষাকেও এই রোগেই পেয়েছে। শুধু মেয়েমানুষ বলে একটু বেশী। মেয়েদের শরীরে অনেক কিছু সয়, কিন্তু স্নায়ুতে সয় না।

আশ্চর্য !

এমন বিচলিত হয়ে গেল যে পাগলামী শুরু করে দিল। ঢাকা থেকে শাড়ী আনানো, মানে কি ? জামদানী কি বস্তু ?

তবে কি বাড়িটা আমিও আবার বেচে দেব ?

আমিও তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছি ?

ঠিক করলাম, বর্ষার বৌদি নার্সিং হোম থেকে ফিরলেই, শালাকে বলে-কয়ে কালীঘাটের বাসা তুলিয়ে দিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। অনেকজন মিলে থাকলে ওই ভয় ভয় ভাবটা কেটে যাবে। ওরাও বিনি পয়সায় বাড়ি পেলে—হঠাৎ বিদ্যুতের মত মনে পড়ে গেল কথাটা।

জীবনরতনও আত্মীয় বন্ধুর দল এনে বাড়ি বোঝাই করেছিল না ?

আর তারা কেউ টিঁকতে পারে নি।

কী আশ্চর্য, ওই আষাঢ়ে গল্পটাকে কিছুতেই যে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

আমি কি তবে ওই কাহিনীর সত্যি মিথ্যে পরীক্ষা করতে বাড়িটা খোঁড়াব ? বাগানের ওই অপূর্ব সুন্দর মার্বেল পাথরে বাঁধানো 'গোলঘর'টাকে উপড়ে দেখব তলায় কোন্ রহস্য নিহিত আছে। যে ঘরটাকে কেবলমাত্র 'বিশ্রাম নিকুঞ্জ' হিসেবেই দেখেছিলাম কেনার সময়।

আজই যদি এত কাজ না পড়তো ! দিনের আলোয় সারাদিন বাড়িটাকে তন্নতন্ন করে দেখতাম।

আরও কতকগুলো অবাস্তব কল্পনা মনের মধ্যে পাক দিতে থাকে।

মেডিকেল কলেজের পাস-করা ডাক্তারদের, মানে ওখান থেকে এতাবৎকাল যত ডাক্তার পাস করে বেরিয়েছে তাদের নামের তালিকা নেই কোথাও কোনখানে ?

পুরনো জার্নালে, কি রেকর্ডের খাতায় ? তা থেকে উদ্ধার হয় না হেমন্ত ঘোষ বলে কোনও ডাক্তার ছিল কিনা কখনও ?

আদালতের সব মামলারও তো শুনেছি রেকর্ড থাকে, তাতে পাওয়া যায় না নাবালক কালীশঙ্কর দে চৌধুরীর পক্ষ হয়ে কোনও হেমন্ত ঘোষ মৃত রাজমোহন মিত্রের শ্বশুরের সঙ্গে মামলা চালিয়েছিল কিনা ?

ওখানে একটা ঘুঁটেওয়ালী আছে না ?

যার নাম নাজমা বেগম ?

সে বলতে পারবে না সঠিক ইতিহাস ?

এসব সংগ্রহ করা, এবং তা থেকে তথ্য উদ্ঘাটন করা যে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব সেকথা যেন মনে থাকে না। প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতাটা কল্পনা হয়ে আদালতের কোনও এক গুদামঘরে রক্ষিত জীর্ণ বিবর্ণ ফাইলের স্তূপ হাঁটকে ফেরে, মলাট ছেঁড়া পাতা হলদে হওয়া যাওয়া পুরনো জার্নালের পাতা ওল্টায়।

এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা !

আচ্ছা হঠাৎ যদি ওই বাড়ির কোনও দেয়ালের খাঁজের মধ্যে থেকে কি কার্নিশের লুকনো গহ্বর থেকে কারও রোজনামচার খাতা বেরিয়ে পড়ে ?

গৌরীশঙ্করের, কি মালতীর ?

প্রভাবতীর কি হেমন্তর ?

প্রভাবতীর তাড়নায় যে খাতাটা নিয়ে যেতে পারে নি হেমন্ত। অথবা আকস্মিক মৃত্যুর রূঢ়তায় পারে নি মালতী ?

রাম মুখুজ্যের ভিটেটা কোনখানে ছিল ?

আজও টিঁকে আছে, না কালের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে ? সেখানেও তো না কোথায় যেন পুণ্যলক্ষ্মীর প্রেতাত্মা একটা থানকাপড় জড়ানো ছায়াদেহ নিয়ে আড়ার বাঁশে ঝুলছে, রুগ্‌ণ শরৎশশী বুকের ওপর ভারী পাথরের জাঁতাখানা নিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে শ্বাস টানছে !

সেখানে কোনও উৎকণ্ঠার বাসা নেই ? ইটকাঠের ঘরখানা ভেঙে

দিলেই কি ওরা চলে যায় ?

আজও কেন তবে মোগল হারেমের অশরীরী কান্না রাজধানীর বাতাসে বাতাসে মর্মরিত গুঞ্জন তোলে ?

জগতে এত কোটি কোটি লোক জন্মাচ্ছে মরছে, কোথাও তো কোনও দীর্ঘশ্বাস ওঠে না ? ওঠে শুধু অত্যাচার আর অনাচারের আঘাত-জর্জরিত আর অপঘাতের ক্রুদ্ধকরুণ বেদনা-বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের পাঁজর থেকে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস বুঝি সমস্ত পৃথিবীর বিলাসিতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, লোভ আর হিংসার বিরুদ্ধে নিরুপায় প্রতিবাদ।

কিন্তু কবরের ওই কান্না কি কোনদিন থামবে পৃথিবীতে ?

সারাদিন ধরে অনেক ঘোরালো চিন্তা আর বড় বড় কথা নিয়ে মাথাটাকে ভারাক্রান্ত করে যখন ফের বর্ষার ভাইয়ের সেই কালীঘাট লেনের বাড়িতে এসে হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

শাশুড়ী বললেন,—আজ আর ওই ভূতুড়ে বাড়িটায় গিয়ে কাজ নেই বাছা, এখানেই ছুটি খেয়ে যেমন-তেমন করে থেকে যাও।

ভূতুড়ে বাড়ি !

পৌরুষে ঘা লাগল।

বললাম—আপনার মেয়ে থাকে থাকুক, আমি যাব। কোন মানে হয় না এসব কথার।

—মানে তো হয় না। এদিকে মেয়েটা তো আমার সারাদিন হিস্টিরিয়া রুগীর মত—

—খুব সম্ভব তাই হয়েছে। কাল একজন ডাক্তারকে দেখাব।

—ডাক্তার তো আমার এই বাড়িরই দোতলার ফ্ল্যাটে রয়েছে। অনন্ত বোস—

—কী ! কী বললেন ? কী নাম ?

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বলেন—ও কি, অমন চমকে উঠছ কেন ? ডাক্তার অনন্ত বোস। খুব একটা নাম-করা না হলেও বিচক্ষণ আছে।

লজ্জিত হলাম। কানে বেজেছিল হেমন্ত ঘোষ।

শ্রীরাধার পৃথিবীকে কৃষ্ণময় দেখার মত আমিও কি সব হেমন্তময় দেখছি ?

লজ্জা ঢাকতে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করি। শালাজের শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রশ্ন, নবজাত বাচ্চাটির স্বাস্থ্য কেমন, ওজন কত, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সেরে বললাম—দিন, কি খেতে দেবেন দিন, পালাতে হবে, রাত হয়ে যাচ্ছে।

শাশুড়ী যেন বিপন্নভাবে বললেন,—কিন্তু আজ আর নাই বা গেলে বাবা ? মেয়েটার যে রকম দেখছি—

—আপনার মেয়েকে তো নিয়ে যাচ্ছি না—আশ্বাস দিয়ে বলি—ও থাক আজ আপনার কাছে। কাল কোনও একটা চাকরবাকর ঠিক করে তবে—

সেইটাই স্থির হল।

বর্ষা যেন রাজীও হল মনে হল, কিন্তু ঠিক যাবার মুহূর্তে আমি যখন বিদায় নিচ্ছি বর্ষা হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে—যাচ্ছ যে ? আমি যাব না ?

বললাম—সে কি, তুমি তো আজ থাকবে কথা হল।

—কথা হল ? কথা অমনি হলেই হল ? চিরদিন কেবল তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে শুধু একা চলে গেছ। আমি পড়ে থেকেছি। কেঁদেছি, ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়েছি, আর লোক দেখিয়ে দেখিয়ে হেসেছি। আর চলতে দেব না ওসব, না না না। আমি যাব তোমার সঙ্গে—

বর্ষা ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

বর্ষার মাও ছুটে আসেন।

ব্যাকুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডেকে ওঠেন—বর্ষা বর্ষা, কী পাগলের মত বকছিস ? কবে আবার জামাই তোকে ফেলে একা একা বেড়াতে গেছে ? মাথাটা কি তোর সত্যিই খারাপ হয়ে গেল ? আমি বলছি এই রাত দুপুরে যাস নে তুই সেই ভূতুড়ে বাড়িতে—

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে স্বভাবছাড়া খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বর্ষা। তারপর বলে,—পাগলের মত কথা তো তুমিই বলছ মা। সাধ করে অমন বাড়িটা বানালো তোমার জামাই, আর আমি যাব না সেখানে ? আমি যাব না তো যাবে কে ? পেতনীরা ? চলো চলো, মার পাগলামী শুনো না। রাত্তিরে তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে যাব, এ বলে কতদিনের সাধ।

হতাশ হয়ে বলি,—তবে দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি নিই।

ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়ে বর্ষা।

আর সারা রাস্তা ভালমানুষের মতই চুপ করে গাড়িতে বসে থাকে রাস্তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে।

ওই ঘাড় আর খোঁপার একাংশটুকুই বড় বেশী চোখে পড়ছে। আর মনে হচ্ছে এ দৃশ্য আর কখনও বুঝি চোখে পড়েনি। ও যেন অনেক দূরের মানুষ, আমার অপরিচিত। ওর গায়ে আমি যদি হাত ঠেকাই ও বুঝি ফোঁস করে উঠবে।

কেন যে এমন মনে হচ্ছিল কে জানে! আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ ওই রকম বসে থাকার পর কিন্তু বর্ষা মুখ ফিরিয়ে সহজভাবেই বলে,—মা এমন অবোধের মত কথা বলেন! তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারি ?

আস্তে ওর একখানা হাত হাতে তুলে নিয়ে বলি—আমিই কি পারি ? নেহাৎ তোমার শরীরের কথা ভেবেই—

—হয়েছে, থাক। কত ভালবাস জানা আছে।

বর্ষা একটু মধুর আবেগময় হাসি হেসে আমার কাঁধে মাথা রাখে।

আর আমি বেকুবের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকি, বর্ষার এই নিতান্ত অপরিচিত ভঙ্গী দেখে অস্বস্তি হয়। বরাবরই বড় বেশী সোজাসুজি মেয়ে বর্ষা।

তবে কি চিরদিনের সেই গ্রাম্য কথাটা বিশ্বাস করতে হবে ? কোনও এক অতৃপ্ত আত্মা ওকে আশ্রয় করে বসেছে ?

উগ্র এই বিজ্ঞানের যুগে ওই অজ্ঞানের মত কথাটা ভাবছি আমি,

ভেবে লজ্জা করল। যুক্তিকে গ্রহণ করলাম। কাল থেকে ওই ভয়ের বিপর্যয়ে বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছে বর্ষা।

সহজ খাতে কথা চালাতে চেষ্টা করছি—আচ্ছা বর্ষা, এখুনি বাড়ি ফিরে কি হবে? চলো না 'নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখতে ঢুকে পড়ি। খাওয়াদাওয়াও হয়ে গেছে দিব্যি—

সিনেমা প্রসঙ্গটা বর্ষার সর্বাধিক প্রিয় বলেই এই কথা তুলি। কিন্তু আজ আর বর্ষা উৎসাহ দেখায় না। বরং আমাকেই নিরুৎসাহ করে দিয়ে বলে—কি যে বলো! এখন আবার ওই সব! চলো চলো বাড়ি চলো।

—আচ্ছা বাড়িতে তোমার আছেই বা কে? কিসের আকর্ষণ এত? এ বরং—

—না না না। তোমার ফন্দী বুঝতে বাকী নেই আমার। ওই কথা বলে ভুলিয়ে পালাবে।

—কি অশ্চর্য! তোমায় ফেলে কোথায় পালাব আমি তাই বলো তো? হঠাৎ তুমি এমন এলোমেলো কথা কেন বলছ বর্ষা?

ওকে একটু জোরে নাড়া দিয়ে বলি—কী হল তোমার? এমন ছেলেমানুষী শুরু করেছ কেন?

বর্ষা আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—উল্টোপাল্টা কথা বলছি? তা হবে। কিছু মনে কোর না। আর বলব না। মা সারাদিন এত বকবক করলেন, মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল। অমন বাড়িটা, বলেঁন কি না—'বেচে দে বেচে দে।' আচ্ছা রাগ হয় না? তা দাদা বৌদির আক্কেল আর দুর্ব্যবহারে মারও মেজাজের ঠিক নেই—

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

বর্ষা পুরনো চেহারায় ফিরে এসেছে।

তাই যে প্রসঙ্গে কখনও সায় দিই না—সেই প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করে বলি—আচ্ছা কেন বলো তো তোমার দাদা বৌদি এমন?

—আর কেন! মানুষের স্বধর্ম।

বর্ষা একেবারে সহজ হয়ে যাচ্ছে—এই তো দেখো না বৌদি নার্সিং হোমে গেছে, ওদের কন্নাটা কে করছে ? ছেলেমেয়েদের দেখা, ওখানে খাবার পাঠানো—কোনও ত্রুটি রাখছেন ? তা এখন শ্রীমতী বৌদি দয়া করে একটু ভাল করে কথা কইছেন মার সঙ্গে, কিন্তু যেই বাড়ি ফিরবেন সেই দেখো ? সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি।

কিন্তু সেই অদ্ভুত আচরণ কি শুধু বর্ষার বৌদিরই ? বাড়ি ফিরে বর্ষাও বদলে যাবে না তো ?

সেই কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে এসে নামি। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাই। আর—বাইরের দরজার চাবি খুলে ভিতরে পা দিতেই নিজের সেই চরম নির্বুদ্ধিতার মুখোমুখি দাঁড়াই। গত কালকের সেই বিগড়ে যাওয়া বিদ্যুৎ লাইন না সারিয়ে রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম সকালে। আর ফিরলাম এই রাত্রে। এখন এই অন্ধকার বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে!

মিনতি করে বললাম—বর্ষা, চলো আবার ফিরে যাই।

বর্ষা বলল—কি যে বলো! তার চাইতে গোটাকতক বাতি কিনে আনো।

—তুমি একা থাকতে পারবে ?

বর্ষা সাহসীর মতই বলল—ওই তো মোড়েই দোকান। এটুকু একা থাকতে পারব না ? কি ভাব তুমি আমায় ? এই দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকব।

খুব সহজ ভাবেই বলল কথাটা। হিস্টিরিয়া রোগী বলে মনে হল না তখন বর্ষাকে।

কিন্তু না, বর্ষা তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। বর্ষা দাঁড়িয়ে থাকেনি। বাতি কিনে এনে বর্ষাকে খুঁজে পাইনি।

যতগুলো বাতি এনেছিলাম সবগুলো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে খুঁজেছি। পাগলের মত চীৎকার করে ডেকেছি —বর্ষা বর্ষা! এ কী করলে তুমি! সাড়া পাইনি, প্রকাণ্ড ফাঁকা বাড়িখানায় শুধু প্রতিধ্বনি গম্‌গম্ করছে।

পাগলের মত বৃথা এলোমেলো খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে কিছু দূরের ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের দোকান থেকে মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে গেলাম। অন্ধকারে পাগল হয়ে যাচ্ছি, খুঁজে পাচ্ছি না বর্ষাকে। ও হয়তো আমার সঙ্গে দুষ্টুমী করছে, লুকিয়ে থেকে ভয় দেখাচ্ছে আমায়। বাতির আলোয় দেখতে পাচ্ছি না ওকে। আলো জ্বলে ওঠার পর কেমন লুকিয়ে থাকে দেখব।

না, পারেনি। আর লুকিয়ে থাকতে পারেনি বর্ষা। কিন্তু কখন বর্ষা বাগানের দরজার কাছে গেল? কেনই বা গেল? দরজা ডিঙোতে গিয়ে কি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে? তাই উপুড় হয়ে পড়ে আছে এলোচুল ছড়িয়ে? বর্ষা কি আজ চুল বাঁধেনি? বর্ষার কি এতও চুল ছিল?

॥ ত্রিশ ॥

নতুন এসেছিলাম, প্রতিবেশী দেখিনি। আশেপাশে যে এত লোক আছে তাও জানতে পারিনি। জানতে পারলাম, বাড়িটা যখন আর বাড়ি রইল না, ভীড়ের মাঠ হয়ে উঠল।

ইশারায় ইঙ্গিতে অস্ফুটে স্পষ্ট গলায় সবাই বলছে—জানতাম। এ আমরা জানতাম। কেউ বাস করতে পারে না এখানে, পায় না ভোগ করতে। কিন্তু আপনি যেন বড্ড তাড়াতাড়ি এভাবে ইয়ে হলেন। এই তো এলেন সেদিন। কত খরচা করে বাড়িটা সারালেন, দেখছি তো অনেকদিন থেকে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছি—দেখ এখন ভদ্রলোকের কপাল।

হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলাম—আগে তো কই বলেননি?

—কি করে বলি বলুন। অজানা অচেনা মানুষ আপনি। আপনি হয়তো ভাববেন আমরাই কোন দুরভিসন্ধির বশে—আচ্ছা ইতিমধ্যে

কোন একজন বাজে লোক আসা-যাওয়া করেছিল ?

চমকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম এক বুড়ো ভদ্রলোক কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। ক্লান্ত গলায় বলেছিলাম—কি রকম লোকের কথা বলছেন ?

—লোক ! মানে আর কি, প্রায় ভদ্রলোকই। আবার ভদ্রলোকও নয়। ইয়ে, আধাবয়সী মত, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, পায়ে ছেঁড়া চটি—

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিলাম প্রতিবেশীর দিকে। দেখেছিলাম সেখানে কিসের যেন অনুসন্ধিৎসা। যেন কী এক রহস্য উদ্‌ঘাটনের আশায় উদগ্রীব।

—হ্যাঁ, ওই ধরনের একজন এসেছিল বটে !—বলেছিলাম শিথিলভাবে। সব কথা বলবার শক্তি খুঁজে পাইনি, ইচ্ছেও হয়নি।

—এসেছিল তো ! হতেই হবে। ওই একটি রহস্যময় ঘটনা মশাই—এ বাড়িতে যখনি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, ওই রকম একটা লোককে নাকি দেখা যায়। কবারই তো দেখলাম। কোথা থেকে যে আসে, আবার কোথায় যে চলে যায় কে জানে ! কে জানে, কি নাম, কি পরিচয়, কোথায় আস্তানা ! জিজ্ঞেস করলে না কি বলে—আমার আবার নামধাম ! আমি মশাই উড়োপাখী ! আপনাকে কি বলেছিল ?

উদগ্র কৌতূহলে তাকিয়ে থাকেন প্রতিবেশী ভদ্রলোক। সেইদিকে তাকিয়ে বুঝি, অনেক কিছুই জানেন ইনি। তবু প্রশ্ন করি না। প্রশ্ন করবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন। বলেছিলাম—আমাকেও ওই কথাই বলেছিল।

—খুব ভয় দেখিয়েছিল, না ?

চুপ করে ছিলাম। প্রতিবেশী বলেছিলেন—জানি দেখাবে। ওই কাজ ওর। বাড়িটা তো ইদানিং ভাড়া খাটতো, আমরা ভাবতাম লোকটা বোধহয় বাড়ির মালিকের শত্রু, ভাড়াটে ভাড়িয়ে জব্দ করবার জন্যে, ভয় দেখিয়ে বাড়িটা হানাবাড়ি বলে ঘোষণা করে মালিককে

লোকসানে ফেলবে। কিন্তু আপনি তো ভাড়াটে এলেন না—কিনলেন। তাতেই ভরসা করছিলাম হয়তো টিঁকে যাবেন। কিন্তু সেই এক! সেই পূর্ব-ঘটনার পুনরাবৃত্তি!

এর আগে—তিন-তিনটে আত্মহত্যা হয়েছে বাড়িটায়, দু-দুটো খুন। কে কখন যেন গলা টিপে—

—আচ্ছা, বাড়ির পুরনো মালিক কে তা জানেন? আদি মালিক? মানে যিনি এ বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করি আমি।

প্রতিবেশী মাথা চুলকে বলেন—শুনতে পাই মশাই, আদিপুরুষের নাম ছিল কি যেন একটা দে চৌধুরী। সে নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছল। তারপর তার ভাইপো পুকুরে ডুবে মরল। তারপর কে যেন বেচে দিয়েছিল এক মুসলমানকে। এ পাড়ায় একটা বুড়ি ঘুঁটেওলি থাকে দেখেছেন? খুব ঘটার নাম বুড়ির। সেই বুড়ির মামাকে বেচে দিয়েছিল। তার তখন খুব বোলবোলাও। আজ তার ভাগ্নী ঘুঁটে বেচছে। দুনিয়াখানাই এই, বুঝলেন দাদা! ওই নাজমা বেগমের মামা বেশ কিছুদিন ভোগজাত করেছিল। তারপর ওই—সেই কে একটা লোক নাকি এসে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছিল। কে জানে মশাই তিন পুরুষ ধরে কেউ ভয় দেখানো ব্যবসা ধরেছে কিনা! তা সে মামা তো—চাটিবা ট তুলে শ্বশুরবাড়িই পালিয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, সে সব তো অনেকদিন আগের কথা। এই লোকটা তো আর তখন, মানে অনন্তকাল তো আর একটা আধাবয়সী লোক আধাবয়সী থাকতে পারে না? বেঁচেও থাকতে পারে না? লোকটা অবিশ্যি একটু অদ্ভুত টাইপের। এমন ভাবে কথা বলে যেন একশো বছর আগের ঘটনা সব চোখের সামনে দেখেছে। আসলে মনে হয় লোকটা অতি বদ। খুব সম্ভব কোন ফেরারী আসামী। খুন-টুন করে ফেরার হয়েছে। খুনের একটা প্রবণতা আছে। লোককে ভয় দেখিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে আমোদ পায়।

ওই ভাইপো কালীশঙ্কর দে চৌধুরী বিয়ে না হতেই মরেছিল।

তার আর বংশ নেই। অনেকদিন আগের ব্যাপার তো, আমার সবই শোনা কথা। তারপর কোথা থেকে নাকি এক গেরুয়াধারী সাধু এখানে এসেছিল, আর ওই বাগানের গোলঘরে ঠায় বসেছিল সাত দিন সাত রাত্রি। না খাওয়া, না শোওয়া, না নড়া। সাতদিন একভাবে থেকে হঠাৎ আবার একদিন নিখোঁজ হলেন।

তারপর সবাই বলাবলি করতে লাগল, সাধু নাকি কালীশঙ্করের সেই জ্যাঠামশাই। তবে কালিশঙ্করের একটা দিদি নাকি বুঝতে না পেরে সাধুকে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল। বড়লোকের স্বধর্ম তো। পরে জানতে পেরে অবিশ্যি জ্যাঠার শোকে পুড়ে মরেছে, এমনও মনে হয় না। জ্যাঠা বলে খুব একটা ভক্তি-ছেদ্দা ছিলও না। তবে হ্যাঁ, অভিশপ্ত বাড়ি বটে। ইট কাঠ সব যেন ক্ষুধার্ত পিশাচ। এই বাড়ি সম্বন্ধে অনেক কিছু কিংবদন্তী শুনতে পাই মশাই। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। ওই ঘুঁটেওলি বুড়ি অনেক খবর রাখে। ওকে যদি একবার—

বলেছিলাম—থাক মশাই, আর কোন খবরে দরকার নেই আমার। যথেষ্ট হয়ে গেছে। রহস্য রহস্যই থাক চিরকাল, আমার কাজ নেই।

ভদ্রলোক বলেন, তা বটে তা বটে, এখন মা জননীর শুশ্রূষার দিকে নজর দিন। আপনি তো মশাই তবু ভাগ্যবান—

॥ একত্রিশ ॥

বন্ধুবান্ধব ছি ছি করতে লাগল। বলল—করলে কি। অমন বাড়িটা ও রকম দাঁওয়ে পেয়ে শেষে এই রকম জলের দরে বেচে দিলে? এত বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে শেষে কিনা ভূতের ভয়ে পলাতক! নাঃ, তুমি আমাদের হাসালে ভাই। একটা বাজে লোকের চাতুরীতে বিভ্রান্ত হলে তুমি।

কেউ কেউ বলল—ইস্! টাকা থাকলে আমিই কিনে নিতাম।

আর তোমার মত এমন ইস্তিরী-পাগল লোক যদি আর কোথাও আছে! ইস্তিরী একটু অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ে মূর্ছা গেলেন, আর তুমি অমনি তাড়াতাড়ি চাটিবাটি তুলে পালিয়ে এসে বাড়িটাই বেচে দিলে। অদ্ভুত! খুব যা হোক দেখালে ভাই। স্ত্রী তো আমাদেরও আছে, ভাব-ভালবাসাও যে একেবারে নেই তা নয়। তা বলে এত!

অবশ্য বন্ধুরা যা বলে আত্মীয়রা তা বলে না। শাশুড়ী বল্লেন—দরকার নেই বাবা অমন ভূতুড়ে বাড়িতে। বেশ করেছ বেচে দিয়েছ। প্রাণ আগে, না টাকা আগে? ভাগ্যিস এ যাত্রা আমার বর্ষা প্রাণে বেঁচে গেল, তা নইলে কী হত বল দিকি? যা সব ইতিহাস শুনলাম বাড়ির! দুর্গা! দুর্গা!

শালাজ বল্লেন—যাই বলুন ঠাকুরজামাই, বেচেছেন না হয় বেশ করেছেন—তবে বেচে দেবার আগে একবার ওই পিছনের বাগানটা যদি খুঁড়িয়ে দেখতেন!

—কী হত তাহলে?

—কী আর হত। দেখতেন সত্যি ওর নীচে পাতালঘর আছে কিনা। থাকলে প্রমাণ হত জগতে ভূত ভগবান সবই আছে।

হেসে ফেলেছিলাম—জগতের অনেক জিনিসই তো এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। আরও একটা না হয় না হল।

—কিন্তু সত্যি বলতে—আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তা আমি কারাগার থেকে ছাড়া পেতে না পেতে আপনি যে একেবারে চোখ-কান বুজে বেচে দিলেন।

—ওই যে একজনরা পাড়ায় একটা মেয়ে-স্কুল খোলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছিল 'বাড়ি বাড়ি' করে। তাদের চাপেই আরও তাড়াতাড়ি। আসলে স্কুলবাড়ির উপযুক্তই বাড়িটা।

—আর সেইজন্যেই—শালা বল্লেন—তারা তোমার চক্ষে বালি নিক্ষেপ করে হাতের মোয়াটি কেড়ে নিতে একটি ঘুঘু দালাল নিয়োগ করেছিল। যাই বলো, লোকটা কিন্তু ঝানু মনস্তত্ত্ববিদ। দেখল, সোজা পথে হওয়ার আশা দুরাশা, অতএব মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে—।

ও বাড়ি টাকা থাকলে আমিই রাখতাম।

—টাকা থাকলে আমিই রাখতাম—একথা বলেছে অনেকে। নিজেকে সবাই বুদ্ধিমান ভাবে, শক্তিমান ভাবে, সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে ভাবে। হয়তো আমিও অপরের ক্ষেত্র হলে এমনিই ভাবতাম। হয়তো কিছুদিন গড়িয়ে গেলে এও ভাবতে পারি—ইস্! কী বোকামীই হয়ে গেছে। ভাবতে পারি, ছি ছি, ভূত বিশ্বাস করলাম। কিন্তু সেদিনের সেই আলো নিভে যাওয়াটা কি দৈবের ঘটনা? আর ওই মেয়ে-স্কুল বসাবার প্রেরণাটা যাদের মধ্যে এল? কেবলমাত্র হৃদয়গত সৎবুদ্ধির প্রেরণা সেটা? না আর কারুর দেওয়া প্রেরণা? কোন এক অভিশপ্ত আত্মা, এই এক অভিনব প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আপন মুক্তির উপায় খুঁজছে নাকি? কে জানে ওই বঞ্চিত পথভ্রান্ত মানুষটার অশান্ত আত্মা এতদিনে তৃপ্তি পাবে কি না!

ভবিষ্যতে কি করব জানি না, এখন তো কিছুতেই ওই লোকটাকে একটা বাজে লোক ভাবতে পারছি না। অতৃপ্ত প্রেমে উন্মাদ সেই অলোকলোকবাসীকে তাই বারবার বলছি—এবারে তবে রেহাই দাও।

মনের মধ্যে ভীড় করছে অনেক নাম, অনেক চরিত্র। অবিশ্বাস করব কেন? কেন ভাবব পুণ্যলক্ষ্মী বলে কেউ ছিল না, ছিল না যোগেশ্বর সামন্ত, রাম মুখুজ্যে! কেন মনে করব মালতী আর গৌরীশঙ্করের গল্প কাল্পনিক, চারুহাসিনী আর ভবানীশঙ্কর, হেমন্ত আর প্রভাবতী, সব অলীক?

জগতের প্রারম্ভ থেকে এমনি করেই তো মানুষ আসছে যাচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় পায়ের চিহ্ন রেখে রেখে। সবাইকে যত্ন করে তুলে রেখে দেবার দায়িত্ব ইতিহাসের নয়। ইতিহাস আপন ভাঁড়ারে তুলে রাখে শুধু বাছাই করা মানুষদের। বাকি সবাই বিবর্ণ হয়ে যায়, ঝরা পাতার মত ঝরে পড়ে। কিন্তু তারাও তো কেউ মিথ্যা নয়। বাছাই করা মানুষদের থেকে একতিলও কম নয়, তাদের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রতিহিংসা। কেউ তাদের মনে রাখে না বলেই কি পৃথিবীর বাতাস হঠাৎ এক-একদিন অশান্ত হয়ে ওঠে তাদের বিক্ষুব্ধ

নিঃশ্বাসে ?

শহর কলকাতার একেবারে মাঝখানে ছোট্ট একখানা বাসা নিয়েছি। একেবারে আনকোরা নতুন। ইট, কাঠ, লোহা, পাথর সব একেবারে তাজা। ঘর দালান বারান্দা অবশ্য ছোট্ট ছোট্ট খুপরি খুপরি। তা হোক, অনাচার আর অত্যাচারে, বিলাসিতায় আর নির্বুদ্ধিতায় জীর্ণ কলঙ্কিত নয়।

তাই বর্ষা চুপি চুপি বলে—তা হোক। এই বেশ, এই ভাল। এই ছোট্টর মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকখানি ফাঁকার মধ্যে আমার আমিটা যায় হারিয়ে। অনেক পেয়ে পেয়ে নিজেকে আর খুঁজে পায় না মানুষ, তাই হয়ত প্রাচুর্যের ইতিহাস শেষ অবধি সবই ভাঙনের ইতিহাস। সেই অনেকটা ফাঁকা ভরে ওঠে কেবল ফাঁকিতে। তখন জীবনের সার্থকতা খুঁজতে যায় চোরাগলির সুড়ঙ্গ পথে। আর ধ্বংস হয়।

আমি হাসি। বলি—অনেক ভাল ভাল কথা শিখেছ দেখছি। আমি কিন্তু সেই মস্ত বড় বাড়িখানা একেবারে ভুলতে পাচ্ছি না।

বর্ষা একটু চুপ করে থেকে বলে—ও বাড়িতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। সেদিন সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম মালতীকে। বাগানের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আমায়।

—থাক ওসব কথা।

—থাক। থাক বলেই তো চাপা দিয়ে রেখেছি। নয়তো কত কথা বলার ছিল। সেদিন হঠাৎ কি মনে হয়েছিল জানো ? আমি যেন আর কেউ। অনেক—অ-নে-ক দিন আগের কেউ। সেই আমি ওই বাড়িতে থেকেছি, সেজেছি, কেঁদেছি, হেসেছি। কত যেন ভালবাসা পেয়েছি, কত যেন দুঃখ পেয়েছি।

—অনেক নভেল পড়লে এই রকমই হয়।

এই কথাই বলি। বলে চাপা দিতে চেষ্টা করি।

নইলে নিজেও তো—কম অভিভূত হইনি।

বর্ষা বলে—তারপর সেই যখন কতদিন যেন বিছানায় পড়েছিলাম?…আচ্ছন্ন চৈতন্যের আবছায়ায় সর্বদা কে যেন বলতো—'তুইও ভয় পেলি? তোরা না এ যুগের? তোরা না পাস-টাস করা বিদুষী?…ছি ছি! বলতো, একটা মনের মতন শরীর পাই না, যাকে ধরি, ছুঁতে গেলেই খসে পড়ে। তবে আর কি করে—'

—থামো বর্ষা। দুর্বল মস্তিষ্কে অমন অনেক বিকার দেখে লোকে। কত প্রলাপই বকে।

কে বলতে পারে অতৃপ্ত আত্মারা, চুপ হয়ে যাওয়া আত্মারা, সেই দুর্বলতার জায়গাগুলোই খুঁজে বেড়ায় কিনা কথা বলতে, ভোগ করতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে!

বর্ষাকে আর নাড়াচাড়া করি না।

কি জানি, অবার কি অনর্থ ঘটে!

প্রসঙ্গ পালটাই।

বলি—বাড়িখানা সস্তায় পেয়ে স্কুল-কর্তৃপক্ষেরাও খুব খুশি। আমায় বলল—আসবেন। দেখবেন।

—ও! স্কুল শুরু হয়ে গেছে?

—শুরু হয়নি, প্রস্তুতি হচ্ছে।

—আচ্ছা স্কুলের নাম ওই 'পুণ্যলক্ষ্মী স্মৃতি বিদ্যালয়'ই রাখবে?

—বলেছে তো।

—প্রশ্ন করেনি কিছু?

—করেছিল। সেই যে বললাম সেদিন, ওই সর্তেই সস্তায় দিয়েছি। তবে—

—কি তবে?

—থাক। থাকগে ওসব আলোচনা।

হ্যাঁ, 'থাক থাক' বলেই সব চাপা দিই। বর্ষা সম্পর্কে আমার এখনও ভয় আছে। এখনও বর্ষা হঠাৎ যেন কেমন কেমন হয়ে যায়, অন্যমনস্কের মত অসংলগ্ন কথা বলে বসে। চোখের দৃষ্টিতে যেন আর

এক জন্মের ছায়া!

এই তো সেদিন।

দাঁড়িয়েছিল দোতলার ঘরের ছোট্ট ব্যালকনিটায়, আমি ছুটির দুপুরের বিশ্রামটাকে উপভোগ করছি খাটে শুয়ে, বর্ষা হঠাৎ ঘরে এসে ব্যস্তভাবে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল,—হ্যাঁ গো, সেই মেয়েগুলোর কি হল?

অবাকের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে বলি,—মেয়েগুলো! কোন্ মেয়েগুলো?

—আঃ, বুঝছ না? সেই মেয়েগুলোর কথা বলছি। সেই একগাদা মেয়ের—

—নাঃ, বুঝলাম না। একটা-আধটা নয়, একেবারে একগাদা মেয়ের সন্ধান চেয়ে বসছ তুমি, এ যে ভারী মুশকিল! কোন্ মেয়ে, কাদের মেয়ে, সে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি না বললে—

সহসাই বর্ষা যেন বর্ষার পাঁপর ভাজার মত মিইয়ে যায়।

বলে—নাঃ, আমারই ভুল হয়েছিল। আচমকা সেই বিধবা মেয়েগুলোর কথা মনে পড়ে গিয়ে—কিন্তু সত্যিই তো তারা এখানে কোথায়!

আর প্রশ্ন করিনি।

বর্ষার মনের মধ্যে কোন্ রহস্যের লুকোচুরি খেলা চলছে, তা জানবার জন্যে অপরিসীম কৌতূহল হলেও, সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করি না।

বরং চাপা দিই।

স্কুল-কর্তৃপক্ষ যে ওদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, তাও বলিনি এখনও বর্ষাকে। কি জানি হঠাৎ যদি বিগড়ে বসে, যদি বলে 'যাব না!'

কিন্তু আমি ওকে দেখাতে চাই। সেই অভিশপ্ত বাড়িটার যে সদ্‌গতি হল এবার সেটা দেখলে হয়তো সহজ হয়ে যাবে ও।

কদিন যেন গেল।

নেমন্তন্ন কার্ডটা বার করে দেখলাম, তারিখটা কাল।

বর্ষাকে কি ভাবে যাওয়ার কথাটা বলব তাই ভাবছি আর ভাবছি যে রকম বৃষ্টি নেমেছে, কালকের দিনটা কেমন থাকবে কে জানে! শনিবারে বৃষ্টি নেমেছে, সাতদিন নেবার দাবী রয়েছে ওর।

বেচারা স্কুল-কর্তৃপক্ষের আমোদটাই মাটি তাহলে। বাগানে প্যাণ্ডেল করে নাকি কী যেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, সভাপতি আর প্রধান অতিথি হয়ে কোন একজন উপমন্ত্রী আর শিক্ষা বিভাগের কে যেন বড়সড় আসবেন, আর আকাশ কিনা এইভাবে বাদ সাধছে!

সকালের দিক থেকে তুপুরে বৃষ্টি আরও বাড়ে, সন্ধ্যায় আরও বেশী। শুধু বৃষ্টি নয়, তার সঙ্গে রীতিমত ঝড়। সারাক্ষণ যেন একটা শেকল বাঁধা বন্য জন্তু 'গোঁ গোঁ' করে আর্তনাদ করছে।

রাত্রে সমস্ত জানলা দরজাগুলো এঁটে শুয়েও সেই গোঁ গোঁ শব্দের আর্তনাদে ঘুম আসছে না। চুপ করে শুয়ে আছি পাছে বর্ষার ঘুম ভেঙে যায়।

সাইক্লোন! একেই তো সাইক্লোন বলে।

একসময় বর্ষাও স্তব্ধতা ভেঙে সেই কথাই বলে ওঠে,—একেই বোধহয় সাইক্লোন বলে, তাই না?

সাড়া পেয়ে চমকাই।

—ঘুমোওনি তুমি?

—না। ঘুম আসছে না।

—সত্যি। আমারও তাই। শুধু তুমি ঘুমোচ্ছ ভেবে—

—বাবাঃ! কে ঘুমোবে! জানলার ওপারে যেন হাজারটা হাতী ক্ষেপে গিয়ে মাতামাতি করছে, শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে আজই বুঝি পৃথিবীর প্রলয়ের দিন!

—ঘুমের ওষুধ খাবে বর্ষা?

—ঘুমের ওষুধ? কেন?

—কেন আর? ঘুম আসবে। আমি তো ভাবছি একটা

ট্যাবলেট খেয়ে নিই। জেগে জেগে ঝড়ের গান শুনলেই তো চলবে না, কাল অনেক কাজ।

তোমার তো সর্বদাই অনেক কাজ। আমার দরকার নেই। এ রকম ঝড়ের রাত কি রোজ আসে?

—আহা কী মধুর! রাত্রে ছাদটা না মাথার ওপর নেমে আসে!

বলে পাশ ফিরে শুই।

আর কখন একসময় যেন ঘুমিয়েও পড়ি ঘুমের ওষুধ না খেয়েই।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

হঠাৎ কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে ঘরের মৃদু নীল আলোয় যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

বর্ষার চুলগুলো খোলা, শাড়ির আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে, আর চাবিবন্ধ আলমারিটার পাল্লার হাতলটা ধরে প্রাণপণে টানাটানি করছে।

কিন্তু শুধু কি চুলগুলোই খোলা বর্ষার? তাড়াতাড়ি বড় আলোটা জ্বেলে যা দেখলাম, তা হচ্ছে বর্ষার গায়ের সমস্ত গহনাগুলোও খোলা। টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে সেগুলো। হঠাৎ আলো পড়তেই যেন তীক্ষ্ণ ঝিলিক মেরে তীব্র হাসি হেসে উঠল।

—বর্ষা, বর্ষা, এ কী হচ্ছে?

বর্ষা হাতলটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত অসহায় ভাবে বলে,—সিঁড়িটা যে খোলা পাচ্ছি না, চাবিটা বন্ধ করল কে?

—চাবির কথা থাক—দৃঢ় হাতে ওকে টেনে এনে বলি—এসব কি? গহনা খুলেছ কেন?

—গহনা!

—হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ না তোমার হাত খালি। বিধবাদের মত হাত খালি করেছ কি জন্যে?

বর্ষা চমকে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমায় জড়িয়ে ধরে বলে,—তুমি আমায় ধরে থাকো। তুমি আমায় ধরে থাকো।

ধরে থাকব।

কিন্তু কোন শক্তিতেও পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে যে।

রাত্রের সেই ঝড়ের দাপাদাপি শেষ রাত্রের দিকে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে এল। এমনকি চারিদিকের বিধ্বস্ত দৃশ্যের ওপর মেঘছাঁকা মনমরা একটু রোদেরও আভাস দেখা দিল।

বর্ষা ঘুমোচ্ছিল অনেক বেলা অবধি, ওকে জাগাইনি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম পথের দৃশ্য। বিশ্রী লাগছিল। ঝড়বৃষ্টির পরের এই মেঘলা রোদটা বড় ক্লেদাক্ত লাগে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মহিমাকে পরাজিত করা আকাশের এই ঘোলাটে হাসিটা কেমন যেন কুৎসিত নির্লজ্জ।

বর্ষাকে জাগাইনি, ও একসময় নিজেই ধড়মড় করে উঠে এল ' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—আটটা বেজে গেছে, ডেকে দাওনি কেন আমায়?

—আহা, ঘুমোচ্ছিলে একটু ছুটির দিন।

—ছুটির দিন! বাঃ, ওখানে যাবে না?

—কোন্‌খানে?

—কোন্‌খানে? কোন্‌খানে? চমৎকার! আজ দশটার সময় ওদের স্কুলের ফাংশান না?

—ওঃ! তাই বটে! কিন্তু যা অবস্থা—সে সব কি আর হবে?

—হবে না! রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে বলে জগতের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে আজ?

তা থাকবে না বটে।

বর্ষার যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। তবু আলস্যভরে বললাম, —তা হয়তো যাবে না সত্যি। কিন্তু কীই বা এমন ফাংশান! সেই তো একটু বক্তৃতা, দুটো গান, খানিকটা ধানাই-পানাই, গিয়ে আর কি হবে?

বর্ষা কথাটা ধৈর্য ধরে শুনল। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই যেন ছিটকে উঠল—তুমি না যাও আমি যাব।

—একা যাবে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাব। নিশ্চয় যাব। গাড়ি না থাকে আমি নিজেই—

—কী আশ্চর্য অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? এখনও তো দু ঘণ্টা দেরী, ততক্ষণে যদি আকাশ একটু পরিষ্কার হয়—

—হোক না হোক যাবই। আকাশ ভেঙে গেলেও যাব। এক্ষুনি যাব।

—কী পাগলামী ! এত আগে—

—আগেই ভাল। আগেই ভাল। যদি গাড়িটাড়ি না পাওয়া যায়।

—তা একটু চা-ও তো খেতে দেবে ?

বর্ষা একটু থমকে বলে—বেশ। কিন্তু চা খেয়ে আর একদণ্ডও না। বুঝছ না কেন, দেরী করলে সব ফুরিয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে।

চা তৈরী করতে করতেও বর্ষা মিনিটে মিনিটে তাড়া দিতে থাকে —ট্যাক্সিটা ডাকতে পাঠাও না।

—বেশ, পাঠাচ্ছি—বলে রীতিমত বিরক্ত হয়েই নতুন চাকরটাকে আদেশ দিই। তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি—বেকুবের মত একঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থেকে কী যে লাভ হবে তোমার বুঝছি না। চলো—এই একঘণ্টা শূন্য প্যাণ্ডেলে হাঁ করে বসে থাকবে চলো। এই জল কাদা, কী যে অবস্থা হয়েছে ঈশ্বর জানেন !

বর্ষা এ তিরস্কার গায়ে মাখল না।

বর্ষা সাজতে গেল।

কিন্তু সকালবেলা একটা স্কুলের অনুষ্ঠানে এত বেশী সাজছে কেন বর্ষা ? এরকম সাজার শখ তো ওর কখনও ছিল না ! ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে আছে, সাজ আর ফুরোচ্ছে না তার।

গত রাত্রের সেই খুলে রাখা গহনাগুলো তো পরেইছে, পোশাকী গহনাও একগাদা বার করে গায়ে চাপাচ্ছে। এসব গহনা যে ওর ছিল

তাই তো জানা ছিল না আমার।

তার উপর আবার গায়ে জড়িয়েছে গাঢ় রঙের বেনারসী শাড়ি। জরি ঝকঝকে।

রীতিমত অস্বস্তি বোধ হয়।

প্রায় কাতর হয়েই বলি—দিনের বেলা! স্কুল-টুলের ব্যাপারে এত সাজার কি ছিল? একটু সাদাসিধে হয়ে গেলে ভাল হত না?

বর্ষা আমার কাতরতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গলায় একটা চিক্ না কি তার ক্লিপটা কষ্টে আঁটতে আঁটতে বলে,—আঃ, নিজে নিজে কি এসব পরা যায়! ঝকমারি!

—কিন্তু আমি বলছি—এত গহনা কাপড়ের দরকারটা কি? এমনি যাহোক—

—এমনি যাহোক! চমৎকার! ভিখিরিদের ঘরের বৌয়ের মত গেলেই বুঝি তোমাদের খুব মুখ উজ্জ্বল হবে?

কেমন একটা ভ্রূভঙ্গী করে কাছে সরে আসে বর্ষা। মদির আলস্যময় একটু হেসে বলে—আর, জন্মে এই প্রথম তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি, সাজব না একটু?

—জন্মে প্রথম আমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছ!

আবার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় আমার। আর কথা যোগায় না।

বর্ষা তেমনি হাসি আর কটাক্ষের সঙ্গে বলে—তবে? কোথায় সঙ্গে করে নিয়ে গেছ আমায়? তাও তো দেখ না, জড়োয়া সেটটা খুঁজেই পেলাম না! মালি একটা মালাও দিয়ে গেল না—সাজ হল কই?

ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে পাথরের মন নিয়ে বলি,—আরও যদি কিছু বাকী থাকে তো বল গাড়িটা ছেড়ে দিই?

—ছেড়ে দেবে? ওমা! সে কি! চলো চলো।

আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে বর্ষা।

কিন্তু 'পুণ্যলক্ষ্মী স্মৃতি বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন উৎসবে যে এত ভীড়ের

ঠেলাঠেলি হবে, একথা কে স্বপ্নে ভেবেছিল ? দূর মোড় থেকে দেখি থেমে থাকা গাড়ির সারি আর লোকে লোকারণ্য। সেই লোকের ঠেলাঠেলি নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে পুলিসকে।

—দেখেছ ? বর্ষা বলে—তুমি বলছিলে এত আগে কেউ আসে-নি। কত লোক এসে গেছে দেখতে পাচ্ছ! উঃ, কী করে যে এই ভীড় ঠেলে—কিন্তু চলো চলো, তাড়াতাড়ি চলো, সব শেষ হয়ে যাচ্ছে-

বর্ষার এ কথাটা সত্যিই হয়েছে বটে।

সবই শেষ হয়ে গেছে।

বোধকরি দে চৌধুরীদের সমস্ত পাপের, সমস্ত অতৃপ্ত বাসনার, সমস্ত পৈশাচিক ক্ষুধার শেষ হল।

ভীড় দেখে বর্ষা উৎফুল্ল হোক, ভীড়টা যে স্বাভাবিক নয়, তা দূরে থেকেই বুঝেছিলাম। ভীড়ের কলগুঞ্জন ছাপিয়ে পুলিসের হুঙ্কার একটা বিপদের সঙ্কেত এনে দিচ্ছিল।

কিন্তু এতটাই কি বুঝেছিলাম ?

বোঝা সম্ভব কি ?

না, সম্ভব নয়।

কল্পনার অতীত, আশঙ্কার অতীত, চিন্তার অতীত এমন ভয়াবহ একটা দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, একথা ভাবিনি।

কালকের সেই প্রলয়ের ঝড় কি কলকাতার আর কোনো বাড়ির ওপর দিয়ে বহে যায়নি ? শুধু এই দে চৌধুরীদের ভিটের ওপর দিয়েই বহেছে ? তার ওপর আছড়ে এসে পড়েছে ?

কে জানে আশপাশের কোন মাটিতে কখন ভাঙন ধরেছে, কখন ভেঙেছে ধ্বস; ওই ভিটের নীচেয় ঘুমিয়ে থাকা চোরা গহ্বরের ঘুম ভেঙেছে সেই ভাঙনে! আর কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠেছে সে!

কিন্তু এ কী অদ্ভুত নিয়তি!

'পুণ্যলক্ষ্মীর স্মৃতি'-পূজার সমস্ত আয়োজন যখন জুমত, সেই

লগ্নমুহূর্তেই কি ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে হয় তার মন্দির, তার নাম !

না, অবশিষ্ট বলতে প্রায় কোথাও কিছুই নেই। বাগানের সেই প্যাণ্ডেল সমেত দে চৌধুরীদের সম্পূর্ণ ভিটেটা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেছে কালকের জলঝড়ে।

অনেক ঘর অনেক বারান্দা অনেক জানলা দরজা তলিয়ে গেছে চোরাঘরের ক্ষুধার্ত জঠরে। তবু উপরের স্তূপও কম বিরাট নয়। সেও এক বিধ্বস্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, নিয়তির নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত।

শুধু সামনের যে বাঁশের গেটটায় লাল শালুতে 'পুণ্যলক্ষ্মী স্মৃতি বিত্যালয়ে'র নামটা টানটান করে টাঙানো ছিল, সেই বাঁশের একটা খুঁটি যেন অভাবিতের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। তার গায়ে লেপটে সেঁটে রয়েছে কাদা জলে ভেজা শালুটা অনেকক্ষণের জমাট হয়ে যাওয়া রক্তের রেখার মত।

বর্ষার দিকে সাহস করে তাকাতে পারছিলাম না, বর্ষার সঙ্গে কথা বলছিলাম না ভরসা করে। কি জানি হঠাৎ কোন্ অস্বাভাবিকতার মোড় নেবে সে ! নাড়াচাড়ায় কাজ নেই।

তা ছাড়া—

এই সকাল দশটার আলোয় আর এই পরিবেশের মাঝখানে বর্ষার সেই সোনাতে জরিতে ঝলমলে মূর্তিটার লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ নেই অন্য সময় হলে ওর কাছ থেকে তফাতে দাঁড়াতুম, অচেনার ভঙ্গীতে দূর থেকে সঙ্গে সঙ্গে এগোতাম, কিন্তু এখন সে সাহসও নেই। তাই ওর একটা হাত চেপে ধরেই ভীড় ঠেলছি, যাতে বেরিয়ে আসতে পারি।

কিন্তু বর্ষার ইচ্ছার বেগ অন্যমুখী।

বর্ষা ওই ধ্বংসস্তূপের খুব কাছে, একান্ত কাছে যেতে চায়, তাই অনবরত চেষ্টা করছে আমার হাত ছাড়িয়ে নিতে।

—ওদিকে আর এগোচ্ছ কেন বর্ষা ? চলে এসো।

—আঃ, চলে আসব কি, দেখতে দাও।

—দেখবার আর আছে কি?

—বাঃ! দেখব না! দেখব না শেষটা কি হল? বলেই হঠাৎ আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ইটপাটকেলের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে সে।....অনেকগুলো লোক হৈ হৈ করে ওঠে।

—বর্ষা! বর্ষা! কী হচ্ছে? বলে আমাকেও হৈ হৈ করে উঠতে হয়। লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

তবু ছুটতে হয় আমাকেও।

কিন্তু বেশীদূর এগোয় না বর্ষা। বাগানে যেখানে প্যাণ্ডেল করেছিল ওরা তার কাছাকাছি গিয়ে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হাস্যে হাততালি দিয়ে ওঠে।

—ঠিক হয়েছে! ঠিক হয়েছে! যেমন কর্ম!

কার কোন্ কর্মের ফল সে পেল, কি ঠিক হয়েছে, সেই বৃথা প্রশ্ন আর করিনি। উন্মাদিনীকে প্রশ্ন করে লাভ কি। কোন রকমে টেনে এনে গাড়িতে পুরি। কিন্তু বর্ষা যেন আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। গাড়ির দরজা খুলতে চেষ্টা করে, জানলা দিয়ে মাথা বাড়ায়।

— দেখতে দিলে না। ভাল করে দেখতে দিলে না।

—কী, দেখতে কী? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ছি ছি!

প্রায় ধমকেই উঠি। রাগে নয়, প্রয়োজনে। আর সে প্রয়োজন সিদ্ধও হয়। বর্ষা স্তিমিত হয়ে যায়। আস্তে নিশ্বাস ফেলে বলে—ছি ছি! তাইতো, আমি এমন হয়ে গেলাম? ছি ছি! কিন্তু কি হল জানো? ওকে অমন ভাবে ওই চোরা সিঁড়ির গর্তয় পড়ে মরতে দেখে ভারী মজা লাগল। মজা লাগায় দোষ হয়েছে না? কিন্তু—বর্ষা অভিমান-অভিমান গলায় বলে—ওর বুঝি দোষ নেই? দে চৌধুরীদের ধ্বংস করে সেই ভিটেয় ও ওর ভালবাসার মানুষের মন্দির বানাবে?

বর্ষা যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলি—কিন্তু ওখানে তো কেউ মরেনি বর্ষা। রাতে তো ছিল না কেউ। কাকে দেখলে তুমি?

—মরেনি? মরেনি?

বর্ষা উত্তেজিত হয়ে ওঠে—বললেই হল? দেখতে পেলে না তোমরা? উঠে আসবার চেষ্টা করেছিল, সাঁড়াশির মতন আঙুল দিয়ে ইঁট আঁকড়ে ধরেছিল! দেখলে না সেই আঙুল?

নাঃ, কোন কিছুই আর দেখতে ইচ্ছে নেই আমার। নিজের নিয়তির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকি।

বর্ষা কি আর কোনদিন স্বাভাবিক হবে?

অলৌকিক জগতের আবছায়া থেকে বাস্তব জগতের আলোয় আবার দেখতে পাবে নিজেকে?

কিন্তু বর্ষা কি পাগলের অস্বাভাবিকতা নিয়ে কেবল ভ্রান্ত ছায়াই দেখেছিল?

পরদিন সকালের কাগজ খুলে নিথর হয়ে যেতে হয় না কি!··· 'কলিকাতা ও শহরতলী'র সংবাদে!·····শনিবার রাত্রের ভয়াবহ ঝড়ে বহু স্থানে ক্ষতির পরিমাণ জানিয়ে সাংবাদিক টালীগঞ্জের 'পুণ্যলক্ষ্মী স্মৃতি বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন সভা পণ্ডের ব্যাপার নিয়ে বেশ ফলাও করে লিখেছেন, এবং প্রকৃতির রুদ্ররোষের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অবশেষে জানিয়েছেন, ওই পুরোনো আমলের অট্টালিকাটির নীচে 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড সেল্' ও সিঁড়ি থাকাই এই বিপর্যয়ের কারণ। নির্মাতা বোধ করি গৃহ নির্মাণ কালে মোগল হারেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে যাই হোক, আরও মর্মান্তিক ব্যাপার এই, "উক্ত দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। লোকটির পরিচয় অজ্ঞাত, অত রাত্রে ওইখানে যাওয়ার কারণ বোঝা যায় না। খুব সম্ভব ওই বাড়ির বারান্দাটিই সেই গৃহহীন দুঃস্থ বৃদ্ধের রাত্রির আশ্রয়স্থল ছিল। ঝড় বৃষ্টিতে সরিয়া যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় হতভাগ্যকে এই শোচনীয় মৃত্যু

বরণ করিতে হইয়াছে।........

ইটের স্তূপ অপসারণ করিয়া মৃতদেহ উদ্ধার করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়।...."

তবে কি বিশ্বাস করতে হবে জগতে 'অসম্ভব' বলে সত্যিই কিছু নেই? বিশ্বাস করতে হবে এই অতিপ্রাকৃত জগতের অন্তরালে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এক অপ্রাকৃত জগতের লীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে? প্রকৃতির কোনও এক দৈবাতের খেয়াল সেই রহস্যজগতের যবনিকা-খানি তুলে ধরে আর ভিতরের দৃশ্যে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়, দিশেহারা হয়ে ওঠে?

না কি সবটাই কাকতালীয়?

কোথাও কোনওখানে কোনো অশরীরী আত্মা অতৃপ্ত বাসনার জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছিল না? সেই বাসনায় এই চলমান জগতে ছায়া ফেলছিল না? এই ঝড় জল, ধ্বংস মৃত্যু সবই--নিতান্ত বাস্তব ঘটনা?

বন্ধুরা বলে—উঃ, খুব 'লাকী' বটে। এ লোকসানটা তো তোমারই হতে পারতো!

বলে—হাত গুনতে জান না কি হে? তাই আগে-ভাগেই বাড়িটা হস্তান্তর করে ফেললে। যাই বলো ভাই, তখন তোমায় বোকা বলেছিলাম, এখন দেখছি ধুরন্ধর ছেলে। কে ভেবেছিল এক রাত্তিরের মধ্যে অতবড় অট্টালিকাটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

কিন্তু বাড়িটা কি সত্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? নিশ্চিহ্ন হয়েই যাবে? সে তার শোচনীয় ইতিহাস আর মহিমময় ঔদ্ধত্য নিয়ে আমার মনের মধ্যে চিরদিন খাড়া হয়ে থাকবে [illegible] কাব্যের সঙ্কেত বহন করে?

আর সেই মৃত্যু?

—শেষ—